সুয়াই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল :
ও সে জেতের দফা, করলে রফা
মজালে তিন কুল।

এই সময়ে কলিকাতা-সমাজ যে দুই বিরোধী দলে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রধান প্রধান কতিপয় ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেই তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। রামমোহন রায়ের দলের প্রধান টাকীর কালীনাথ রায়, (মুন্সী) মথুরানাথ মল্লিক, রাজকৃষ্ণ সিংহ, তেলিনী পাড়ার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি কতিপয় ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিও তাঁহার অনুচর ছিলেন। প্রাচীন হিন্দুদলে রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতি সহরের প্রায় সমগ্র বড়লোক ছিলেন। ইঁহাদের কাহার কাহারও সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত দিয়া এ পরিচ্ছদের উপসংহার করিতেছি।

দ্বারকানাথ ঠাকুর।

ইংরাজদিগের প্রাচীন দুর্গ বিনষ্ট হওয়ার পর তাঁহারা যখন আবার গোবিন্দপুর গ্রাম লইয়া নূতন ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, তখন জয়রাম ঠাকুর নামক একজন দেশীয় ভদ্রলোকের উল্লেখ দেখা যায়। দ্বারকানাথ এই জয়রাম ঠাকুরের বংশজাত। ১৭৯৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে (Sherburne) সার্ব্বরণ নামক একজন ফিরিঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন; এতদ্ভিন্ন পারসী ও আরবী ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ফার্গুসন (Fergusson) নামক একজন বারিষ্টারের নিকট আইন শিক্ষা করেন। ইহাতে আইন আদালতের কার্য্যকলাপ বিষয়ে পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল। তৎপরে তিনি কিছু দিন নীল ও রেশমের রপ্তানীর কাজ করেন। অবশেষে নিমকের এজেণ্ট প্লাউডেন (Plowden) সাহেবের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুইদিনে ধনী হইয়া উঠিত। এইরূপে সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ও কতিপয় বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়া বিষয় কার্য্য হইতে অবসৃত হন; এবং 'কার

টেগোর এণ্ড কোং' নামক এক কোম্পানি স্থাপন করিয়া স্বাধীন বণিকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। তদ্ভিন্ন 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' নামে এক ব্যাঙ্কের প্রধান নির্ব্বাহকর্ত্তা হন। সহৃদয়তা, বদান্যতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাঁহার সমকক্ষ লোক কলিকাতাতে ছিল না। তাঁহার উপার্জ্জন শক্তি যেমন অদ্ভুত, দানশক্তি ও তেমনি অদ্ভুত ছিল। ১৮২৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সহরের সম্ভ্রান্ত ধনীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। ইঁহার অপরাপর কীর্ত্তি পরে উল্লিখিত হইবে। ১৮৪৬ সালে ইংলণ্ডে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাধাকান্ত দেব।

ইনি পরে শব্দকল্পদ্রুম প্রণেতা রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি লর্ড ক্লাইবের মুন্সী নবকৃষ্ণ দেবের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার সভাবাজারের রাজবংশসম্ভূত গোপীমোহন দেবের পুত্র। তাঁহার পিতা গোপীমোহন দেব দেশের কল্যাণকর অনেক কার্য্যে সহায়তা করিতেন। এই সভাবাজারের রাজবংশ চিরদিন কলিকাতা হিন্দু সমাজের অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন। ১৭৯৩ সালে রাধাকান্ত দেবের জন্ম হয়। ইনি ইংরাজী, পারসী, আরবী ও সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ইঁহাকেই তাহাদের প্রতিপালক ও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে বরণ করেন। তিনিও সেই কার্য্যে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদ্ব্যতীত দেশহিতকর অপরাপর কার্য্যের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭। ১৮১৮ সালে যখন স্কুলবুক সোসাইটী ও স্কুল সোসাইটীদ্বয় স্থাপিত হয়, তখন তিনি উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ও দ্বিতীয় সভার অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। বর্ষে বর্ষে নিজের ভবনে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সকলের বালক-দিগকে সমবেত করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিতেন; এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানের জন্য নিজে "স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই ১৮২৬ সালে কলিকাতা সহরে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষকরূপে অগ্রণী হইয়া তিনি দণ্ডায়মান। পরে ইনি রাজসম্মান সূচক স্যার উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, বহুকাল হিন্দুসমাজপতির সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, ১৮৬৭ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন ধামে মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

রামকমল সেন।

ইনি সুবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ। ইনি সম্ভবতঃ ১৭৯৫ কি ১৭৯৬ সালে গঙ্গাতীরবর্ত্তী গৌরীভা গ্রামে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামকমলের পিতা হুগলীতে ৫০ টাকা বেতনে শেরেস্তাদারী করিতেন। রামকমল ১৮০১ সালে শিক্ষার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮০৪ সালে ডাক্তার হণ্টারের (Dr. William Hunter) প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থানী প্রেসে একটী কর্ম্ম পান। ১৮১০ সালে ডাক্তার লীডেন (Leaden) ও ডাক্তার এইচ, এইচ, উইলসন (H. H. Wilson) ঐ প্রেসের সত্বাধিকারের অংশী হন। ১৮১১ সালে ডাক্তার হণ্টার ও ডাক্তার লীডেন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া জাবা দ্বীপে গমন করেন; তখন ডাক্তার উইলসন হিন্দুস্থানী প্রেসের একমাত্র সত্বাধিকারী থাকেন; এবং রামকমল তাঁহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮১২ সালে রামকমল ফোর্ট উইলিয়াম কালেজে একটী কর্ম্ম পান। ১৮১৮। ১৮১৯ সালে ডাক্তার উইলসনের সাহায্যে রামকমল এসিয়াটীক সোসাইটীর কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে তিনি নিজের প্রতিভা, পরিশ্রম ও কার্য্যদক্ষতার গুণে উক্ত সোসাইটীর দেশীয় সম্পাদক ও কমিটীর সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি টাঁকশালের দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে যে যে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহার অনেকের সঙ্গে তাঁহার যোগ ছিল। ১৮১৭ সালে হিন্দুকালেজ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার কমিটীতে ছিলেন। কিছুদিন নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যে মেডিকেল কমিশন নিয়োগ করেন তিনি তাহার একজন সভ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন উচ্চশ্রেণীর একখানি বৃহৎ ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার দেহান্ত হয়।

মতিলাল শীল।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কলুটোলা নামক স্থানে সুবর্ণবণিক্ কুলে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা চৈতন্যচরণ শীল কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। ইনি পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ভালরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই। তবে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বাঙ্গালা ও শুভঙ্করী উত্তমরূপ শিখিয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলিকাতার সুরতির বাগানের

মোহনচাঁদ দের কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই বিবাহই ইঁহার সমুদয় ভাবী উন্নতির সহায় হইয়া উঠে। তিনি নিজ শ্বশুরের সহিত তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে যাত্রা করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নানা দেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে একটী সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেখানে থাকিতে থাকিতে ১৮১৯ সালে নিজে স্বাধীন ভাবে বোতল ও কর্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই ব্যবসায়ে অনেক লাভ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কেল্লার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বিদেশাগত জাহাজ সকলের মুচ্ছুদিগিরি কর্ম্ম আরম্ভ করেন। ইহাতে তিনি প্রভূত ধনশালী হইয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার কাজ ও তৎসঙ্গে ধনাগমও বাড়িতে থাকে। অবশেষে তিনি কলিকাতার কোম্পানির কাগজের বাজারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া উঠেন। কিন্তু তাঁহার প্রশংসার বিষয় এই তিনি ধনার্জ্জনের জন্য অসৎপন্থা কখনও অবলম্বন করেন নাই। তিনি শিষ্ট, মিষ্টভাষী ও পরোপকারী লোক ছিলেন। ১৮৪২ অব্দে একটী অবৈতনিক কলেজ স্থাপন করেন। তাহা এখনও তাঁহার বদান্যতার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। ১৮৫৪ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ১৮২৬ সালে তিনি একজন সহরের উন্নতিশীল ধনী ও নেতাদিগের মধ্যে প্রধান-শ্রেণীগণ্য ছিলেন।

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সে সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া কলিকাতা সমাজকে মহা আন্দোলন ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্মোপাসনা স্থাপন, ইংরাজীশিক্ষা প্রচলন, ও সহমরণ নিবারণ, এই তিনটী আলোচনার বিষয় ছিল; এবং স্কুলের বালকগণও এই আলোচনার আবর্ত্তের মধ্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। এই জন্য এই সকলের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম। বঙ্গদেশের নবযুগের সূচনাক্ষেত্রে, এই আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে, বালক রামতনু কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যারম্ভ করিলেন।

বালক রামতনু যদিও তখন এই সমুদয় গোলমালের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না, তথাপি পথে ঘাটে যে বাগ্বিতণ্ডা, যে আন্দোলন চলিত তিনি কিয়ৎপরিমাণে তাহার অংশী না হইয়াও থাকিতে পারিতেন না। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যেমন রামমোহন রায়ের দল ও রাধাকান্ত দেবের দল দুই দল হইয়াছিল, তেমনি স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও দুই দল হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা তর্ক বিতর্ক হইত; এবং কখন কখনও মুখামুখি ছাড়িয়া হাতাহাতি পর্য্যন্ত দাঁড়াইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও হিন্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

১৮২৮ সালে লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটীর স্কুল হইতে বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া হিন্দু কালেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার হিন্দু কালেজের শিক্ষার বিবরণ দিবার অগ্রে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও হিন্দুকালেজের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

দেওয়ানী কার্য্যের ভার কোম্পানির হাতে আসার পরেও অনেক দিন ফৌজদারী কার্য্যভার মুসলমান কর্ম্মচারীদের উপরেই ছিল। তখন বিচারকার্য্যে ইংরাজ জজদিগকে সাহায্য করিবার জন্য এক এক জন মৌলবী সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইত। এই অভাব দূর করিবার জন্য, এবং মৈত্রী প্রদর্শন দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট মুসলমান সমাজকে প্রীত করিবার আশয়ে, প্রথম গবর্ণর জেনেরাল ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাহাদুর কলিকাতাতে একটী মাদ্রাসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান এ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহদাতা ও সহায় হইলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে উক্ত মাদ্রাসা স্থাপিত হইল। উহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই কালেজ স্থাপন বিষয়ে গবর্ণর জেনেরাল এতই উৎসাহিত হইয়াছিলেন, যে বিলাতের প্রভুদের অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই, কালেজ গৃহ নির্ম্মাণের জন্য নিজ তহবিল হইতে ষাটি হাজার টাকা দিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় কোর্ট অব্ ডিরেক্টারসের সভ্যগণ নাকি পরে ঐ অর্থ তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন হেষ্টিংস বাহাদুরের প্রযত্নে ঐ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত বার্ষিক ত্রিশ সহস্র টাকা আয়ের উপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করা হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আরবী ও পারসী রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইত; এবং একজন প্রাচীন মৌলবী তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহার পর ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীধামে তত্রত্য রেসিডেণ্ট জোনাথান ডন্‌কান বাহাদুরের প্রযত্নে একটী সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়। এই জোনাথান ডনকান তৎকালের প্রসিদ্ধ ভারত-হিতৈষী ইংরাজদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। এদেশীয়দিগের সহিত মিশিতে, বন্ধুতা করিতে, ও তাহাদের হিতচিন্তা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। এজন্য তৎকালীন ভারতবাসী ইংরাজগণ তাঁহাকে আধা হিন্দু বলিয়া মনে করিতেন। সে সময়ে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজপুতানা, ও পঞ্জাব প্রভৃতি অনেক প্রদেশে, বিশেষতঃ রাজপূতদিগের মধ্যে, সূতিকাগারে কন্যা-হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। ডনকান কাশীতে অবস্থিতি কালে বহু-সংখ্যক রাজপুত পরিবারকে কন্যা-হত্যা হইতে বিরত হইবার জন্য শপথ-বদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে তিনি অপর অনেকজন কর্ম্মচারীর সহিত কন্যা-হত্যা নিবারণার্থ গুজরাট ও রাজপুতানাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন! এই ভারত-হিতৈষী রাজপুরুষের চেষ্টাতে কাশীতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়। প্রথম বর্ষে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট চতুর্দ্দশ সহস্র মুদ্রা মঞ্জুর করেন। পরবর্ষে বার্ষিক ব্যয় ত্রিশ সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত হয়।

কাশীর কালেজের নিয়মাবলীর মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, সেখানে বৈদ্যশাস্ত্রের অধ্যাপক ব্যতীত আর সমুদয় অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-জাতীয় হইবেন; এবং মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে।

পূর্ব্বোক্ত উভয় নিয়ম দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে, যে তদানীন্তন রাজপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে অতীব কুণ্ঠিত ছিলেন; বরং সেই সকল রীতি নীতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিতেন। কেবল তাহা নহে, সে সময়ে ভারতবর্ষীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশীয়দিগের প্রাচীন ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিধিমতে সহায়তা করিতেন। বড় বড় হিন্দু পর্ব্ব ও মহোৎসবাদির দিনে ইংরাজদুর্গে তোপধ্বনি হইত; ইংরাজ সৈন্যগণ শান্তিরক্ষার ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য মহোৎসব স্থলে উপস্থিত থাকিত; এবং অনেক স্থলে জেলার মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তীর্থস্থানের বড় বড় মন্দিরের রক্ষকরূপে কোম্পানি তাহাদের আয়ের অংশী ছিলেন। এজন্য "পিলগ্রিমস্ ট্যাকস" বা "যাত্রীর কর" নামে এব প্রকার শুল্ক আদায় করা হইত। ১৮৪০ সালে দেখা যায় এতদ্দ্বারা বঙ্গদেশে বর্ষে বর্ষে প্রায় তিন লক্ষ টাকা উঠিত। এ কথা এক্ষণে অনেকের নিকা

উপকথার মত লাগিতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত এই সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল। আরও শুনিলে সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, যুদ্ধাদিতে জয় লাভ হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কালীঘাট প্রভৃতি তীর্থের বড় বড় মন্দিরে পূজারিদিগের দ্বারা পূজা দেওয়া হইত। উক্ত সালে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড অকল্যাণ্ড বাহাদুর রাজবিধির দ্বারা ঐ সকল নিয়ম রহিত করেন। পূর্ব্বকার রাজনীতি কি প্রকার ছিল তাহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশেই এই সকলের উল্লেখ করা গেল।

যাহা হউক, যখন এদেশে রাজপুরুষদিগের অনেকে এদেশীয়দিগের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হইতেছিলেন, তখন যে ইংলণ্ডের লোক একেবারে সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এরূপ বলা যায় না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পত্র পুনর্গ্রহণের সময় উপস্থিত হয়। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় সেই প্রশ্ন সমুপস্থিত হইলে চার্লস গ্রাণ্ট (Charles Grant) নামক একজন ভারত-হিতৈষী পুরুষ এদেশীয়দিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্ম্মপ্রচার এবং এদেশ প্রবাসী ইংরাজগণের ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতি-বিধান একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এতদর্থ তিনি একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের সভ্যগণের হস্তে অর্পণ করেন। এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া ক্রীতদাস-প্রথা-নিবারণকারী সুবিখ্যাত উইলবারফোর্স সাহেব চার্লস গ্রাণ্টের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি ডনডাস্ বাহাদুর প্রথমে ইঁহাদিগের প্রস্তাবের সপক্ষতা করিবার আশা দেন; কিন্তু পরে কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভ্যগণের প্ররোচনাতে সে পথ পরিত্যাগ করেন। সুতরাং গ্রাণ্টের প্রস্তাবে বিশেষ ফল ফলিল না।

এইরূপে যখন একদিকে স্বদেশ-বিদেশে ভারত-হিতৈষী ব্যক্তিগণ ক্ষীণ ও দুর্ব্বলভাবে এদেশীয়দিগের অজ্ঞান অন্ধকার হরণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন, তখন অপরদিকে শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্ট, ডাক্তার ফ্র্যান্সিস্ বুকানান হামিল্টন নামক একজন কর্ম্মচারীকে কোন কোনও বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে দেশের শিক্ষাসম্বন্ধীয় অবস্থাও একটা জ্ঞাতব্য বিষয় ছিল। হামিল্টন অনেক জিলা পরিদর্শন করিয়া এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তদ্দ্বারা দেশের অবস্থা বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। তাহার সকল বিবরণ এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ একটী স্বতন্ত্র জিলাতে পরিণত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার হামিল্টন ইহার প্রজা সংখ্যা ৯২৬৭২৩ বলিয়া গণনা করেন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটীও পাঠশালা দেখিতে পান নাই। দেশের অপরাপর কোন কোনও স্থানে সংস্কৃতের চর্চ্চা কিছু ছিল বটে, কিন্তু তাহাও কেবল ব্যাকরণ, স্মৃতি ও ন্যায়ের শিক্ষাতে পর্য্যবসিত হইত। যে জ্ঞানের দ্বারা হৃদয় মন সমুন্নত হয়, জগত ও মানবকে বুঝিবার সহায়তা হয়, এমন কোনও জ্ঞান দেশে বিদ্যমান ছিল না। এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থসকল পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞাত ছিল।

শিক্ষা সম্বন্ধে যখন দেশের এই দুরবস্থা, তখন নানা কারণের সমাবেশ হইয়া দেশের লোকের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি, আকৃষ্ট হইতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর যতই ইংরাজ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসন কার্য্যের জন্য আইন আদালত প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, যতই ইংরাজ বণিকগণ দলে দলে আসিয়া কলিকাতা সহরে আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই এদেশীয়দিগের, এবং বিশেষ ভাবে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের, মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে কলিকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী শ্রীরামপুর নগরে কেরী, মার্সম্যান ও ওয়ার্ড নামক তিনজন ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক বাস করিতে-ছিলেন। শ্রীরামপুর তখন দিনেমার জাতির অধীনে ছিল। সে সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া এমন ভয়ে ভয়ে বাস করিতেন যে নিজরাজ্য মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম-প্রচার করিবার অধিকার দিলে পাছে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, এই ভয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রচারকত্রয়কে কলিকাতাতে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করিবার অনুমতি দেন নাই। তদনুসারে তাঁহারা ডেন-মার্কের অধিপতির নিকট প্রচারের অনুমতি-পত্র লইয়া শ্রীরামপুরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে পীতাম্বর সিং নামক কায়স্থ-জাতীয় এক ব্যক্তিকে তাঁহারা সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তৎপরে বৎসরের পর বৎসর খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের দুই দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইতে লাগিল। প্রথম, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধান করা, দ্বিতীয়তঃ, দেশীয় ভাষাতে বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষার

অনুশীলন করা। ইঁহাদের প্রযত্নে শ্রীরামপুরে উক্ত উভয় বিষয়েই উন্নতি হইতে লাগিল এবং তাহার ফল সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

এই কালের আর একটী অনুষ্ঠান উল্লেখ-যোগ্য। সে সময়ে যে সকল সিবিলিয়ান পুরাতন হালিবরি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে আসিতেন, তাঁহাদিগকে আসিয়াই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতে হইত এবং শাসন সংক্রান্ত বিবিধ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত। তাঁহারা যখন এদেশে পদার্পণ করিতেন তখন সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় ভাষা, এদেশীয় রীতি নীতি, এদেশীয় লোকের স্বভাব চরিত্র, মনের ভাব, প্রভৃতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। এজন্য তাঁহারা অনেক সময়ে আপনাদের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না; অনেক সময়ে অজ্ঞতা বশতঃ উৎকোচজীবী নিম্নতম কর্ম্মচারীদের আশ্রয় লইতেন; অনেক সময়ে বিচার কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ করিয়া ফেলিতেন। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্‌লি এই অভাবটী দূর করিবার চেষ্টা করেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লির ন্যায় প্রতিভাশালী ও মনস্বী গবর্ণর জেনেরাল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, যে নবাগত সিবিলিয়ান-দিগকে কিছুদিন কলিকাতাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়া পরে রাজকার্য্যে প্রেরণ করিবেন। তদনুসারে ১৮০০ সালে কলিকাতাতে ফোর্ট উইলিয়াম কালেজ নামে একটী কালেজ স্থাপন করিলেন। কালেজ স্থাপন করিলেই পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন হইল। তখন বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক ছিল না। লর্ড ওয়েলেসলি কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্ররোচনায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার নামক উড়িষ্যা-দেশীয় কালেজের একজন পণ্ডিত বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে রাজীবলোচন প্রণীত "কৃষ্ণচন্দ্র চরিত", কেরী প্রণীত "বাঙ্গালা ব্যাকরণ", রামরাম বসু প্রণীত "প্রতাপাদিত্য চরিত" ও "লিপিমালা", মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত "বত্রিশসিংহাসন" ও "রাজাবলী," চণ্ডীচরণ মুন্সী প্রণীত 'তোতার ইতিহাস,' হরপ্রসাদ রায় প্রণীত "পুরুষ পরীক্ষা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঐ সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশের ভাষা পারসী-বহুল ও দুর্বোধ। তখনকার বাঙ্গালা ও বর্ত্তমান বাঙ্গালাতে এত প্রভেদ যে পাঠ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

এই ফোর্ট উইলিয়াম কালেজ বহু বৎসর জীবিত ছিল। উইলিয়াম কেরী ইহার প্রথম শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন। আর এক কারণে এই কালেজ বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছে। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিছুদিন ইহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বেতালপঞ্চবিংশতি" নামক গ্রন্থ রচনার সংকল্প করেন। উহা ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। বেতালপঞ্চবিংশতিকে বর্ত্তমান সুললিত বঙ্গভাষার উৎপত্তি-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

একদিকে ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের সাহায্যে পরোক্ষভাবে দেশে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা চলিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, অপরদিকে কলিকাতা সহরের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে নিজ সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে লাগিল। সুবিধা বুঝিয়া কয়েকজন ফিরিঙ্গী কলিকাতার স্থানে স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন। সার্বরণ (Sherburne) নামক একজন ফিরিঙ্গী চিতপুর রোডে একটী স্কুল স্থাপন করিলেন। সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এই স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। মার্টন বাউল (Martin Bowle) নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আমড়াতলায় এক স্কুল স্থাপন করেন; সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীল সেই স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আরটুন পিট্রাস (Arratoon Petres) নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আর একটী স্কুল স্থাপন করেন; তাহার যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলুটোলার কানাইতাই সেন ও খোঁড়া অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভাঙ্গা ভাঙ্গা ব্যাকরণ-হীন ইংরাজী বলিতে পারিতেন এবং লিখিতে পারিতেন বলিয়া তৎকালীন কলিকাতা সমাজে ইঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। ইঁহারা যাত্রা মহোৎসবাদিতে আপনাদের পদগৌরবের চিহ্ন স্বরূপ কাবা চাপকান পরিয়া এবং জরীর জুতা পায়ে দিয়া আসিতেন। লোকে সম্ভ্রমের সহিত ইঁহাদের দিকে তাকাইত।

সে সময়ে যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সে সময়ে বাক্য-রচনা-প্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার দিকে দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে প্রধানতঃ মনোযোগ দেওয়া হইত। যে যত অধিক সংখ্যক ইংরাজী শব্দ ও তাহার অর্থ কণ্ঠস্থ করিত, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাহার তত খ্যাতি প্রতিপত্তি হইত। এরূপ শোনা যায় শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ সে সময়ে

এই বলিয়া তাঁহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সার্টিফিকেট দিতেন যে এ ব্যক্তি দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব্দ শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন কোনও বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা সাঙ্গ করিয়া স্কুল ভাঙ্গিবার সময় নামতা ঘোষাইবার ন্যায় ইংরাজী শব্দ ঘোষান হইত। যথা

ফিলজফার—বিজ্ঞলোক, প্লৌম্যান—চাষা।
পমকিন—লাউ কুমড়া, কুকুম্বার—শষা॥

অনেকে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাক্য-রচনাহীন ও ব্যাকরণ-ইংরাজী শব্দের দ্বারা তৎকালীন ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কিরূপে ইংরাজ-সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেন। সে সম্বন্ধে কলিকাতা সহরে প্রাচীন দিগের মধ্যে অনেক কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। তাহার অনেক পাঠকগণ পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রণীত "সেকাল ও একাল" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। দুই একটীমাত্র এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

একবার বড় ঝড় হইয়া একখানি জাহাজ গঙ্গার তীরে লাগিয়া আড় হইয়া পড়ে। পরদিন সেই জাহাজের সরকার বাবু ইংরাজ প্রভুকে আসিয়া বলিতেছেন—"শার্ শার্ শিপ ইজ এইটিওয়ান্" অর্থাৎ জাহাজ একাশি হইয়া পড়িয়াছে।

কোন ইংরাজের অধীনস্থ একজন বাঙ্গালি কর্ম্মচারী প্রতিদিন দুপর বেলা সাহেবের ঘোড়ার দানা খাইয়া টিফিন করিতেন। দুষ্ট সহিশগণ এই সুবিধা পাইয়া ঘোড়ার দানা চুরি করিয়া বেচিত। ক্রমে এবিষয় প্রভুর কর্ণগোচর হইলে তিনি ভৃত্যদিগকে যখন তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা বলিল—"হুজুর! আপনার বাবু রোজ রোজ ঘোড়ার দানাতে টিফিন করেন"। সাহেবের বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল। তিনি বসুজ মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন—"নবীন! তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফিন কর?" নবীন বলিলেন—"ইয়েশ্ শার্ মাই হাউস মানিং এণ্ড ইবনিং টুয়েণ্টি লীভস্ ফল, লিটিল্ লিটিল্ পে, হাউ ম্যানেজ?—অর্থাৎ আমার বাটীতে প্রাতে ও সন্ধ্যাতে কুড়ি খানা পাত পড়ে এত কম বেতনে কিরূপে চলে! শুনিতে পাওয়া যায় বসুজ মহাশয়ের এই উক্তিতে ইংরাজটী নাকি সদয় হইয়া তাঁহার বেতন বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন।

এই ভাবে যতদূর কথাবার্ত্তা চলা সম্ভব তাহাই চলিত। ইংরাজেরা ভাবে, আকারে ইঙ্গিতে, বুঝিয়া লইতেন; এবং সেই সকল কথা তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে সাম্বাহ্নিক ভোজের সময়ে আমোদ প্রমোদের বিশেষ সহায়তা করিত।

যখন এইরূপে ইংরাজী শিক্ষার জন্য দেশের লোকের ব্যগ্রতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল তখন সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ছিল না। পাছে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে দেশের লোক বিরক্ত হয় এই ভয়ে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে হাত দিতেন না। প্রসঙ্গক্রমে একটী ঘটনা উল্লেখ করিলেই তাঁহারা কিরূপ ভয়ে ভয়ে থাকিতেন তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর হইতে পারস্য ভাষায় লিখিত একখণ্ড পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাতে মহম্মদীয় ধর্ম্মের উপরে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে কলিকাতা রাজপুরুষগণ ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিলেন। উক্ত পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিবার জন্য ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র গেল। তদনুসারে শ্রীরামপুরের ডেন রাজপুরুষগণ অবশিষ্ট ১৭০০ কি ১৮০০ পুস্তক কেরী প্রভৃতি প্রচারকদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া কলিকাতাতে গবর্ণর জেনেরালের মন্ত্রি সভার হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপ ভয়ে ভয়ে যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা যে কেন হঠাৎ ইংরাজীশিক্ষা প্রদানে কৃতসংকল্প হন নাই তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি।

এই ভাবে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গেল। ঐ বৎসর গবর্ণর জেনেরাল লর্ড মিণ্টো বাহাদুর এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে লিখিলেন;—

"It is a common remark that Science and Literature are in a progressive state of decay among the Natives of India. From every inquiry which I have been enabled to make on this interesting subject, that remark appears to me but too well-founded. The number of the learned is not only diminished, but the circle of learning even amongst those who still devote themselves to it, appears to be considerably contracted. The abstract sciences are abandoned, polite literature neglected, and no branch of learning cultivated but what is connected with the peculiar religious doctrines of the people. The immediate consequence of this state of things is the disuse and even actual loss of many books and it is to be apprehended, that unless Government interpose with a fostering hand, the revival of letters may shortly become hopelesss from a want of books or of persons capable of explaining them."

অর্থ—সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, ভারবর্ষের প্রজাবর্গের মধ্যে উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতি হইতেছে। আমি যতদূর অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি তাহাতে উক্ত প্রকার উক্তির যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হইতেছে। কেবল যে বিদ্বান ও পণ্ডিত জনের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে তাহা নহে, যাঁহারা বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ও বিদ্যার ক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ হইতেছে। মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আর অধীত হয় না; বিদগ্ধজনোচিত সুকুমার সাহিতের আদর নাই; এবং প্রজাকুলের বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাস সংক্রান্ত সাহিত্য ভিন্ন অন্য বিদ্যার সমাদর দৃষ্ট হয় না। এই প্রকার অনাদরের ফল এই হইয়াছে, যে অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আর অধীত হয় না; এমন কি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; এবং এরূপ প্রতীয়মান বোধ হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট যদি সাহায্যকারী হইয়া হস্তার্পণ না করেন, তবে পাঠ্য গ্রন্থের ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে বিদ্যার পুনরুদ্ধার অসাধ্য হইয়া পড়িবে।

এইরূপে দেশের প্রাচীন বিদ্যার বিলোপাশঙ্কার সূচনা করিয়া লর্ড মিণ্টো প্রস্তাব করিয়াছিলেনঃ—

"I would accordingly recommend that in addition to the College at Benares (to be subjected, of course, to the reform already noticed) Colleges be established at Nuddea and at four * * in the district of Tirhoot.

অর্থ—অতএব আমি পরামর্শ দেই যে কাশীর কালেজ ব্যতীত, (সে কালেজের যেরূপ সংস্কার করিতে হইবে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি) নবদ্বীপে ও ত্রিহুতের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে আর দুইটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপন করা হউক।

কেন লর্ড মিণ্টো বাহাদুর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বহুবৎসরের ঔদাসীন্য-নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সংস্কৃত বিদ্যার রক্ষার্থে এই প্রস্তাব করিলেন তাহার কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে। সে ইতিবৃত্ত এই,—সার উইলিয়াম জোন্সের সময় হইতে ভারত-প্রবাসী ইংরাজদিগের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনা করা একটা বাতিক স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সংস্কৃতবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া তাঁহাদের মান সম্ভ্রম লাভের একটা প্রধান উপায়-স্বরূপ ছিল। এই কারণে অল্প বা অধিক পরিমাণে সংস্কৃত জানা সে সময়কার ভদ্র ইংরাজদিগের একটা ফ্যাসানের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সুবিখ্যাত সংস্কৃত-বিদ্যাবিৎ কোলব্রুক সাহেব গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত-

বিদ্যাতে তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত লোক বিদেশীয়দিগের মধ্যে অল্পই দৃষ্ট হয়। কেবল তিনিই যে এ বিষয়ে গবর্ণর জেনেরালের পরামর্শদাতা ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। ডাক্তার এইচ উইলসন, জেম্‌স ও টোবি প্রিন্সেপ ভ্রাতৃদ্বয়, হে মেকনাটেন, মিষ্টর সদরল্যাণ্ড, মিষ্টর সেক্সপীয়র প্রভৃতি যে সকল সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পরবর্ত্তী সময়ে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের সহিত ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ এ সময়ে কোলব্রুক মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষক ও গবর্ণর জেনেরালের পরামর্শদাতা ছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইঁহাদের অনেকে সংস্কৃতে গভীর বিদ্যা লাভ করিতে গিয়া দেখিয়াছিলেন, এ দেশীয় পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাঁহারা সামান্য ব্যাকরণের সূত্র, সামান্য দুই-চারিখানি কাব্য, নব্য স্মৃতি দুই চারিটী ব্যবস্থা, ও ন্যায়ের দুই চারিটী ফাকি হইয়া কালাতিপাত করিছেন; প্রকৃত বিদ্যা ও প্রাচীন গ্রন্থাবলী দেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে সেই জন্য তাঁহারা পশ্চাতে থাকিয়া গবর্ণর জেনেরালকে উত্তেজিত করিতে তুলিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টো বাহাদুরের এই লিপি ও তজ্জনিত স্বদেশ বিদ্যে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার ফল এই হইল যে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পত্র পুনর্গ্রহণের সময় পার্লেমেণ্টের দ্বারা পাই কোর্ট অব ডিরেক্টারসের সভ্যগণ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিম্নলি আদেশ প্রচার করিলেন;—

"That a sum of not less than a lac of Rupees, in e year, shall be set apart, aud applied to the revival improvement of literature, and the encouragement of learned natives of India and for the introduction and motion of a knowledge of the sciences among the Bri territores of India."

অর্থাৎ—প্রত্যেক বৎসরে অন্যূন এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে তাহা ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিতগণের উৎসাহদান ও ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তন ও উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হইবে।

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত কিছুই করা হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঐ বৎসরে, ১৭ই জুলাই, কমিটী অব পব্লিক ইনষ্ট্রকশন (Committee of Public Instruction) নামে একটী কমিটী গঠিত হয়। ঐ কমিটীর সভ্যগণ সেই এক লক্ষ টাকা প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের

মুদ্রাঙ্কণ, পণ্ডিতদিগের বৃত্তি, ও সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের বৃত্তি প্রভৃতিতে ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। তাহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

১৮১৪ সাল আর এক কারণে চিরস্মরণীয়। ঐ সালে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বিষয়কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার ও পরিরক্ষণের মানসে কলিকাতাতে আসিয়া বাস করিলেন; এব প্রধানরূপে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

রামমোহন রায় কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অপরাপর অভাবের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব অতিশয় অনুভব করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় কলিকাতাতে আসিলেই ডেবিড হেয়ারের সঙ্গে বন্ধুতা হইল। হেয়ার এদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষার অভাব বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন; এবং তাঁহার ঘড়ির দোকানে সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত সে বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন। রামমোহন রায়ের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার সর্ব্বদা কথোপকথন হইত। রামমোহন ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুদিগকে লইয়া "আত্মীয় সভা" নামে যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ১৮১৬ সালে সেই সভার এক অধিবেশনে হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন সভাভঙ্গ হওয়ার পর হেয়ার পুনরায় ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধানের প্রসঙ্গ উথাপন করিলেন। কথোপকথনের পর স্থির হইল যে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার চেষ্টা করা হইবে। সে সময়ে বৈদ্যনাথ মুখুয্যে নামক ইংরাজী-শিক্ষিত একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি পরবর্ত্তী-কাল-প্রসিদ্ধ হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকুল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় আত্মীয় সভার একজন সভ্য ছিলেন; এবং তাঁহার একটা প্রধান কাজ এই ছিল যে তিনি সর্ব্বদা পদস্থ ইংরাজদিগের ভবনে ভবনে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া বেড়াইতেন, এবং সহরের, বিশেষতঃ দেশীয় বিভাগের, সকল সংবাদ দিতেন। অনুমান করা যায়, বৈদ্যনাথ মুখুয্যেই হেয়ার ও রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংবাদ তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট (Sir Hyde East) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করিয়া থাকিবেন। তখন সার হাইড ইষ্ট নিজেও বোধ হয় এ দেশীয়দিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। সুতরাং বৈদ্যনাথের মুখে উক্ত প্রস্তাবের কথা শুনিবামাত্র তিনি অতীব উৎসাহিত হইয়া হেয়ার ও রামমোহন রায়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন; এবং বৈদ্যনাথ মুখুয্যেকে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত

বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মনের ভাব জানিবার জন্য নিয়োগ করিলেন। বৈদ্যনাথ যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলেন, সকলেই মহা উৎসাহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তদনুসারে উক্ত ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে সার হাইড ইষ্ট মহোদয়ের ভবনে সহরের বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের একটী সভা হইল। তাহাতে একটী কালেজ স্থাপনের বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল। সকলের উৎসাহাগ্নি যখন প্রজ্বলিত, তখন হঠাৎ সংবাদ প্রচার হইল, যে রামমোহন রায় এই প্রস্তাবের মধ্যে আছেন, এবং তিনি প্রস্তাবিত কালেজ-কমিটীতে থাকিবেন। সে সময়ে সহরের হিন্দু ভদ্রলোকদিগের রামমোহন রায়ের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি এমনি প্রবল ছিল যে এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র সকলে বাঁকিয়া বসিলেন; "তবে এই কালেজের সহিত আমাদের কোনও সম্পর্ক থাকিবে না।" সার হাইড ইষ্ট মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। যে পুরুষদ্বয় এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী, তাঁহাদের একজনকে কিরূপে পরিত্যাগ করেন। তিনি নিরুপায় দেখিয়া ডেবিড হেয়ারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হেয়ার তাঁহার বন্ধুকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি বলিলেন, "আপনি চিন্তা করিবেন না, রামমোহন রায় শুনিবামাত্র নিজেই কমিটী হইতে নিজের নাম তুলিয়া লইবেন।" তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। তিনি গিয়া রামমোহন রায়কে এই কথা বলিবামাত্র তিনি বলিলেন "সে কি কথা! কমিটীতে আমার নাম থাকা কি এতই বড় কথা যে সেজন্য একটা ভাল কাজ নষ্ট করিতে হইবে?" তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের নাম তুলিয়া দিবার জন্য সার হাইড ইষ্টকে পত্র লিখিলেন।

ইহার পর উক্ত মাসের ২১শে তারিখে আবার এক সভা হইল, তাহাতে কালেজ স্থাপন করা স্থির হইল; এবং তদর্থ একটী কমিটী গঠন করা হইল। বৈদ্যনাথ মুখুয্যে ও লেফ্‌টেনেণ্ট আর্ভিন (Lieutenant Irvine) নামক একজন ইংরাজ উভয়ে উহার সম্পাদক হইলেন। কমিটীতে প্রথমে কুড়িজন এদেশীয় লোক ও দশজন ইংরাজ নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি গরাণহাটা নামক স্থানে মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কালেজ খোলা হইল।

কেবল যে কলিকাতা সহরেই ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য এইরূপ আয়োজন হইল তাহা নহে। এই সময়েই মফঃস্বলের নানা স্থানেও ইংরাজী শিক্ষার উপায়-বিধানের চেষ্টা হইতেছিল। গঙ্গাতীরবর্ত্তী চুঁচুড়া সহরে রবার্ট মে (Robert May) নামক লণ্ডন মিশনারি সোসাইটীভুক্ত একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক বাস করিতেন। তিনি ১৮১৪ সালে সেখানে একটী ইংরাজী

স্কুল খোলেন। প্রথম দিন ১৬টী মাত্র বালক উপস্থিত হয়। কিন্তু ত্বরায় ছাত্র-সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টর ফর্বস্ (Mr Forbes) ওলন্দাজদিগের পরিত্যক্ত পুরাতন কেল্লাতে স্কুলের জন্য একটী প্রশস্ত ঘর দিলেন। রেভরেণ্ড মে সেথানে স্কুল করিতে লাগিলেন। দুই এক বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকটী শাখা স্কুল স্থাপিত হইয়া ঐ সকল স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বালক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। মিষ্টর ফর্বস্ স্কুলগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে প্রীত হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক ৬০০ ছয় শত টাকা সাহায্য দেওয়াইয়া দিলেন। রেভরেণ্ড মের চুঁচুড়ার স্কুলগুলির উন্নতিদর্শনে উৎসাহিত হইয়া বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর আপনার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটীকে ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিলেন।

ওদিকে শ্রীরামপুরে কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারিগণ ইংরাজী শিক্ষার এই মহা-আন্দোলনের মধ্যে উদাসীন ছিলেন না। ১৮১৫ সালে তাঁহারা শ্রীরামপুরে তাঁহাদের সুপ্রসিদ্ধ কালেজের সূত্রপাত করিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যে নানা স্থানে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে রামমোহন রায় ধর্ম্মবিহীন শিক্ষাকে বড় ভয় পাইতেন। সেজন্য নবপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কালেজের ধর্ম্মবিহীন শিক্ষাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। এ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরে একজন আসিয়া তাঁহাকে বলিল—"দেওয়ানজি, অমুক আগে ছিল polytheist, তার পর হইয়াছিল diest, এখন হইয়াছে atheist." রামমোহন রায় হাসিয়া বলিলেন,—"শেষে বোধ হয় হইবে beast"। যাহা হউক তিনি মিশনারিদিগের ধর্ম্মানুগত শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্য ১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার ডফ আসিয়া সাহায্য চাহিলেই তাঁহার স্কুল স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

এই সময়ে এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৪ সালে কাশীধামে জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটীর হস্তে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দিয়া যান। গবর্ণমেণ্টকে ইংরাজী শিক্ষা দান বিষয়ে উদাসীন দেখিয়াই তিনি ঐ প্রকার করিয়া থাকিবেন।

এদেশে রাজপুরুষগণ অনেক সময়ে প্রজাবৃন্দের চিন্তা, রুচি, প্রবৃত্তি ও

আকাঙ্ক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া কিরূপ দূরে দূরে বাস করেন তাহার অপরাপর প্রমাণের মধ্যে একটী প্রমাণ এই যে, যখন দেশের সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষার জন্য এত আগ্রহ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তখন গবর্ণর জেনেরাল ও তাঁহার পারিষদবর্গ কেবল প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ এবং নদীয়া ও ত্রিহুতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। নদীয়া ও ত্রিহুতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হওয়া কর্ত্তব্য কি না, এই চিন্তা করিতে গিয়া তাঁহাদের বোধ হইল যে এতদূরে উক্ত কালেজদ্বয় স্থাপন করিলে তাহাদের পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও উন্নতিবিধানাদি করিবার সুবিধা হইবে না। কাশীর কালেজ ও কলিকাতার মাদ্রাসা, এই উভয় বিদ্যালয়ের সমুচিত তত্ত্বাবধান করার কঠিনতাও কিয়ৎপরিমাণে তাঁহাদের এই সংস্কারকে বলবান করিয়া থাকিবে। তখন তাঁহারা কলিকাতাতে একটী সংস্কৃত কালেজ স্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন।

১৮২৩ সালে কমিটী অব পবলিক ইনষ্ট্রক্শন্ নামে যে কমিটী স্থাপিত হয় তাহার প্রতি এই কালেজ স্থাপনের ভার অর্পিত হইল; এবং ১৮১৩ সাল হইতে যে বার্ষিক এক লক্ষ করিয়া টাকা জমিতেছিল তাহা তাঁহাদের হস্তে অর্পিত হইল। তাঁহারা মহোৎসাহে সংস্কৃত কালেজ স্থাপন, ছাত্রদিগকে বৃত্তিদান, ও প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থসকল মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে অগ্রসর হইলেন। এই সকল কার্য্যের জন্য কিরূপ ব্যয় হইতে লাগিল তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে আরবী 'আবিসেন্না' নামক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত করিতে প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবং ছাত্রদিগের পাঠার্থ পারসী ভাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রন্থের অনুবাদ করা হইয়াছিল, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬ টাকা করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল। সেই অনুবাদিত গ্রন্থ সকল আবার ছাত্রেরা বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্বয়ং অনুবাদককে মাসিক ৩০০৲ তিন শত টাকা বেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অপরদিকে মুদ্রিত ও অনুবাদিত গ্রন্থ সকল ক্রেতার অভাবে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিতে লাগিল। বহুকাল পরে কীটের মুখ হইতে যাহা বাঁচিল, তাহা কাগজের দরে বিক্রয় করিতে হইল। এই সকল কারণে অল্পকাল মধ্যেই কমিটীর সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল; তাঁহারা দুই দল হইয়া পড়িলেন।

১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রামমোহন রায় পূর্ব্ব হইতেই ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার

বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্য দেখিয়া মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। যখন দেখিলেন সে দিকে মনোযোগী না হইয়া গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার কার্য্যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে যাইতেছেন, তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুরকে নিজের মনের ভাব জানাইয়া একখানি পত্র লিখিলেন। ঐ পত্রের শেষাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে সকল উন্নত ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের হৃদয়কে অধিকার করে নাই, এবং অল্পদিন হইল ইউরোপে প্রবল হইয়াছে, তাহা সেই ক্ষণজন্মা যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হৃদয়ে ধারণা করিয়াছিলেন।

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the school-men, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of intruction, embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful sciences, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments, and other apparatus."

অর্থ—যদি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ রাখা উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্ত্তে বেকনের প্রবর্ত্তিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে না দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই অজ্ঞতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্ণমেণ্টর আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎ-পরিবর্ত্তে এদেশীয়দিগের উন্নতিবিধান যখন গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে উন্নত ও উদার রীতি অবলম্বন করা অবশ্যক, যদ্দ্বারা অপরাপর বিষ-য়ের সহিত, গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান বিদ্যা ও

অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ এখন প্রস্তাবিত কার্য্যে ব্যয় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলে, ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটী কালেজ স্থাপন করিলে, ও তৎসঙ্গে পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ সকল দিলেই পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

সুবিখ্যাত বিশপ হিবার (Blshop Heber) এই পত্র লর্ড আমহার্ষ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পত্রখানির প্রার্থনা পূর্ণ হইল না বটে, কিন্তু তাহার ফল স্বরূপ এই নির্দ্ধারণ হইল যে কলিকাতার মধ্যস্থলে যে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হইবে, তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কালেজের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হইবে। তদনুসারে ১৮২৪ সালের ২৫শে ফ্রেব্রুয়ারি সম্মিলিত কালেজ-গৃহদ্বয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

এই সময়ে আর একটী পরিবর্ত্তন ঘটে। হিন্দু কালেজের জন্য ইহার স্থাপনাকালে যে ১১৩১৭৯ টাকা মূলধন রূপে সংগৃহীত হয়, তাহা জোসেফ বেরেটো নামক এক ইটালীদেশীয় সওদাগরের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ১৮২৪ সালে বেরেটো কোম্পানি দেউলিয়া হইয়া যাওয়াতে ঐ অর্থের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া ২৩০০০ টাকা মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং কালেজ কমিটী নিরুপায় হইয়া গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দিতে প্রস্তুত হন, কিন্তু প্রস্তাব করেন যে তাঁহাদের নিযুক্ত কোনও কর্ম্মচারীকে কালেজের পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে। তদনুসারে তদানীন্তন কমিটী অব পবলিক ইনষ্ট্রক্শনের সম্পাদক এইচ্ এইচ্ উইলসন সাহেব প্রথম পরিদর্শক নিযুক্ত হন। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে মাসে ৯০০ শত টাকা, পরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫০ টাকা করিয়া সাহায্য দিতে থাকেন।

১৮২৮ সালে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটীর স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে আসিলেন। তখন এই নিয়ম ছিল, যে বর্ষে বর্ষে স্কুল সোসাইটীর স্কুল হইতে অগ্রগণ্য ছাত্রেরা হিন্দু কালেজে আসিত। তাঁহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা মন্দ, তাহাদের বেতন স্কুল সোসাইটী দিতেন। তাহারা অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দু কালেজে পাঠ করিত। লাহিড়ী মহাশয় সেই শ্রেণীগণ্য ছাত্ররূপে হিন্দুকালেজে আসিলেন। দিগম্বর মিত্রও সেই সঙ্গে আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। এখানে যে সকল

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও। (৮৭ পৃষ্ঠ

সহাধ্যায়ীর সহিত সম্মিলিত হইলেন, তন্মধ্যে রামগোপাল ঘোষ পরে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাহার পরবর্ত্তী সময়ের যৌবনসুহৃদগণ তখন কেহ প্রথম শ্রেণীতে, কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কেহ বা তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ করিতেছিলেন। হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও (Henry Vivian Derozio) নামে একজন ফিরিঙ্গী যুবক, তখন ঐ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গের নবযুগ-প্রবর্ত্তক এই অসাধারণ প্রতিভাশালী শিক্ষকের কিছু বিবরণ এখানেই দেওয়া আবশ্যক।

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও।

ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইটালী পদ্মপুকুরের সন্নিহিত মামলালীর দরগা নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে পোর্ত্তুগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গী। ইঁহার পিতা জে স্কট কোম্পানির সওদাগরী আফিসে একটী বড় কর্ম্ম করিতেন। ইঁহার আর দুই ভ্রাতা ও দুই ভগিনী ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা স্বচ্ছল অবস্থাতে ফিরিঙ্গীসমাজে সম্ভ্রমের সহিত বাস করিতেন। কিন্তু সে সময়ে ফিরিঙ্গীসমাজের বালকগণ সৎশিক্ষার অভাবে প্রায় বিকৃত হইয়া উঠিত। ডিরোজিওর জ্যেষ্ঠ সহোদর ফ্রাঙ্ক কুসঙ্গে পড়িয়া বিপথে পদার্পণ করে; এবং সকল কর্ম্মের বাহির হইয়া যায়। দ্বিতীয় ক্লডিয়সকে পিতা শিক্ষার্থ স্কটলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পরের সংবাদ জানি না। প্রথমা ভগিনী সোফিয়া ১৭ বৎসর বয়সে গতাসু হন। সর্ব্বকনিষ্ঠা এমিলিয়া ডিরোজিওর প্রতি বিশেষ অনুরক্তা ও সকল বিষয়ে তাঁহার উৎসাহদায়িনী ছিলেন।

সে সময়ে ডেবিড ড্রমণ্ড নামে একজন স্কটলণ্ড দেশীয় লোক কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে একটী স্কুল খুলিয়াছিলেন। এই ড্রমণ্ড সে সময়ের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার রচিত কবিতা সকল সে সময়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। এরূপ শুনা যায় যে ধর্ম্মবিষয়ে আত্মীয় স্বজনের সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি চিরদিনের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। যে স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে ফরাসি বিপ্লবের অভ্যুদয়, সেই স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিতেছিল। ড্রমণ্ড বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ বলিতে লাগিলেন, সেখানে পড়িলে বালকগণ নাস্তিকতাতে বর্দ্ধিত হইবে। এই ভয়ে অনেকে স্বীয় স্বীয় বালককে তাঁহার বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন না।

ডিরোজিওর পিতামাতা সে ভয় করিলেন না। বালক ডিরোজিও সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

ড্রমণ্ডের প্রতিভার এক প্রকার জ্যোতি ছিল যাহাতে তিনি বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং স্বীয় হৃদয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার সংস্রবে আসিয়া বালক ডিরোজিওর প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল। চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাহির হইলেন। বাহির হইয়া কিছুদিন তাঁহার পিতার আফিসে কেরাণী-গিরি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেন। তৎপরে কিছুদিন ভাগলপুরে তাঁহার এক মাসীর ভবনে বাস করেন। তাঁহার মাসী উইলসন নামক একজন নীলকর ইংরাজকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগলপুরে থাকিবার সময় বালক ডিরোজিও একাকী গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন; এবং কবিতা রচনা করিতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার জ্ঞান-স্পৃহা এমনি প্রবল ছিল যে সেই অল্প বয়সে ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমুদয় গ্রন্থাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন।

সে সময়ে ডাক্তার গ্রাণ্ট (Dr. Grant) নামে একজন ইংরাজ 'ইণ্ডিয়া গেজেট' (India Gazette) নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতেন। ঐ পত্রে ডিরোজিওর লিখিত কবিতা ও প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। শুনিতে পাওয়া যায় সুবিখ্যাত জর্ম্মান দার্শনিক ইমানুয়েল ক্যাণ্টের গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ডিরোজিও তাহার এক সমালোচনা বাহির করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সে সময়কার পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে এমন প্রখর ধীশক্তি ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল, যে সকলেই অনুভব করিয়াছিলেন যে লেখক একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ভাগলপুরে বাস কালে ডিরোজিও যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে Fakir of Jhungeera নামক কবিতাই সুপ্রসিদ্ধ। ভাগলপুরের সন্নিকটে নদীগর্ভস্থিত ঝঙ্গীরা নামক এক অরণ্যময় আশ্রমে এক ফকীর বাস করিতেন। তাঁহার আশ্রমকে উদ্দেশ করিয়াই ডিরোজিও উক্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিতা প্রকাশিত হইলে, তদানীন্তন শিক্ষিত ইংরাজ ও বাঙ্গালি সমাজে ডিরোজিওর কবিত্ব-খ্যাতি প্রচার হইয়া গেল। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও তাঁহার কবিতাপুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য কলিকাতাতে আসেন। সেই সময়ে হিন্দুকালেজে একটী শিক্ষকের পদ খালি হয়; স্কুল কমিটী সেই পদে ডিরোজিওকে নিযুক্ত করেন। ১৮২৮ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, কিন্তু চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালকদিগকে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ তাঁহার চারি দিকে ঘিরিত। তিনি তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে ভালবাসিতেন। স্কুলের ছুটী হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন; এবং নানা বিষয়ে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপর পক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন; এবং স্বাধীন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি কেবল স্কুলের ছুটীর পর বালকদিগের সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইতেন না; তাহাদিগকে আপনার বাড়ীতে যাইতে বলিতেন। সেখানে তাহাদিগের সহিত বয়স্য ভাবে মিশিতেন, নিজের জননী ও ভগিনী এমিলিয়ার সহিত তাহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতেন, এবং বিধিমতে আতিথ্য করিতেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, প্রভৃতি কতিপয় বালক ডিরোজিওর ভবনে সর্ব্বদা গতায়াত করিত। এক দিনের ঘটনা লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শোনা গিয়াছে। একবার তিনি রামগোপাল ও দক্ষিণারঞ্জনের সহিত ডিরোজিওর ভবনে গিয়াছিলেন। সেখানে পূর্ব্বোক্ত দুই জনে তাঁহাকে চা খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান ফিরিঙ্গীর বাড়ীতে চা খাইবেন, ইহা কি হইতে পারে? সুতরাং তিনি অস্বীকৃত হইলেন। দক্ষিণারঞ্জন অনুরোধ করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বলপ্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লাহিড়ী মহাশয় চীৎকার করিবার উপক্রম করাতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সকলে বুঝিতেই পারিতেছেন ডিরোজিওর ভবনে হিন্দুকালেজের অগ্রসর বালকদিগের হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পান ভোজনের অভ্যাস হইয়াছিল।

এই সময়কার আর একটী ঘটনা লাহিড়ী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। কেবল যে ডিরোজিওর ভবনে কালেজের বালকদিগের সম্মিলন হইত তাহা নহে। দক্ষিণারঞ্জনের উদ্যোগে অপরাপর ইউরোপীয়দিগের ভবনেও মধ্যে মধ্যে বালকদের নিমন্ত্রণ হইত। সে সময়ে হাবড়াতে রেভারেণ্ড হাউ (Rev. Hough) নামে একজন খ্রীষ্টীয় প্রচারক বাস করিতেন। রামমোহন রায়ের আনুকূল্যের সাহায্যে হাউ মহোদয়ের ভবনে এক দিন বালকদিগের সম্মিলন

হয়। তাঁহার কন্যা, কুমারী হাউ, দক্ষিণারঞ্জনের প্ররোচনাতে লাহিড়ী মহাশয়কে এক গ্লাস শেরি পান করিতে দিলেন। দক্ষিণারঞ্জন আসিয়া কাণে কাণে বলিলেন, "ইংরাজ সমাজের এই নিয়ম যে ভদ্রমহিলারা কিছু আহার বা পান করিতে দিলে, তাহা আহার বা পান না করা অসভ্যতা, অতএব পান না কর, একবার ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করাও"। লাহিড়ী মহাশয় অনিচ্ছাসত্ত্বে তাহাই করিলেন। এইরূপে কালেজের ছাত্রগণের মধ্যে সুরাপানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল।

কিরূপে প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত দলে সুরাপান প্রবেশ করিয়াছিল তাহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার-ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারকদলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় পরোক্ষভাবে সুরাপান শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে তিনি রাত্রিকালে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবিলে বসিয়া ইংরাজী রীতিতে খানা খাইতেন। ইহা হইতে এদেশীয় কোন কোনও ধনী পরিবারে রাত্রিকালে খানা খাইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাত্রিতে ভোজন করিবার সময় রামমোহন রায়ের পরিমিতরূপে সুরাপান করিবার নিয়ম ছিল। তাঁহাকে কেহ কখনও পরিমিত সীমাকে লঙ্ঘন করিতে দেখে নাই। এ বিষয়ে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। এরূপ শোনা যায় একবার একজন শিষ্য কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক তাঁহাকে একগ্লাস অধিক সুরা পান করাইয়াছিলেন বলিয়া তিনি ছয়মাস কাল তাহার মুখ দর্শন করেন নাই।

রাজা বোধ হয় এ কথাটা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই যে, যাহা তাঁহার পক্ষে পরিমিত সীমার মধ্যে রক্ষা করা সুসাধ্য ছিল, তাহা অপরের পক্ষে সর্ব্বনাশের কারণ হইতে পারে। পরবর্ত্তী সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই সুরাপান নিবন্ধন আমরা অনেক ভাল ভাল লোক অকালে হারাইয়াছি। যাহা হউক, যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে সুরাপান করা সুসংস্কারহীন সংস্কারকদিগের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি হিন্দুকালেজে পাঠ করেন এবং তাঁহার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসরের অধিক হইবে না, তখনি তি

সুরাপান করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন। নন্দকিশোর বসু মহাশয় একদিন শুনিলেন যে তাঁহার পুত্র বন্ধুদের সঙ্গে মিশিয়া কখন কখনও অতিরিক্ত সুরাপান করে। তখন তিনি একদিন রাজনারায়ণ বাবুকে গোপনে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"তুমি কি মদ খাও?" তিনি বলিলেন—"হাঁ"। তখন তাঁহার পিতা আলমারি খুলিয়া একটী বোতল ও একটী মদের গ্লাস বাহির করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ সুরা ঢালিয়া পুত্রকে পান করিতে দিলেন, এবং নিজে একটু পান করিলেন। বলিলেন—"যখনি সুরাপান করিবে তখনি আমার সঙ্গে পান করিবে, অন্যত্র পান করিবে না।" তাঁহার সঙ্গে পান করিলে সন্তান সর্ব্বদা পরিমিত সীমার মধ্যেই থাকিবে, বোধ হয় এইরূপ চিন্তা করিয়াই ও প্রকার বলিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে সে সময়কার সংস্কার পথে অগ্রসর ব্যক্তিগণ সুরাপানকে হীন চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং ডিরোজিওর শিষ্যগণ অপরাপর দিকে অগ্রসর হওয়ার ন্যায় সুরাপান বিষয়েও যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ডিরোজিওর সংশ্রবে আসিয়া হিন্দু কালেজের ছাত্রগণের মনে মহা বিপ্লব ঘটিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া একাডেমিক এসোসিএশন (Academic Association) নামে একটী সভা স্থাপন করিলেন। তিনি তাহার সভাপতিত্ব করিতেন, এবং তাঁহার শিষ্যদল প্রধান বক্তা হইত। এই সভা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের একটী প্রধান ঘটনা। ইহার বিশেষ বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়া যাইবে।

কালেজের বালকগণের মধ্যে যে নব অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, যে নবজীবনের সঞ্চার হইল, তাহা নানা দিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয় যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, তখন ডিরোজিওর শিষ্যগণ একত্র হইয়া "Athenium" নামে এক মাসিক ইংরাজী পত্রিকা বাহির করিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাজ ছিল। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র লিখিলেন—"If there is any thing that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism."—"যদি হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে কিছুকে ঘৃণা করি, তবে তাহা হিন্দুধর্ম্ম।" এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ পত্রিকার দুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার উইলসন তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন।

এই মাধবচন্দ্র মল্লিক পরে ডেপুটী কালেক্টর হইয়া কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলেন।

তাঁহার বিষয়ে কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় আত্ম-জীবনচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন :—
"কলিকাতা নিবাসী মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে হিন্দুকালেজের একজন সুশিক্ষিত ছাত্র এই জেলার (নদীয়া জেলার) ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আইসেন। রামতনু বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা থাকাতে, তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, এবং আমরাও তাঁহাকে গুরুজনের ন্যায় জ্ঞান করিতাম। তিনি চাঁদসড়কে নিজালয়ে শ্রীপ্রসাদের স্কুল লইয়া গেলেন, এবং তাহার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্নবান হইলেন। আর আমরা এখানকার যুবকবৃন্দ কুসংস্কার নিবারণের ও চরিত্রের সংশোধনের জন্য যে উদ্যোগ করিতেছিলাম, সে বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতে লাগিলেন।"

পরে আবার বলিতেছেন ; —

"আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরা পান বিশেষ দোষাকর ও পাপ-জনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ; এবং মদ্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহা আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিত-জনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে, সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে ? হিন্দুকালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এদেশের সমাজ-সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দুকালেজের সুশিক্ষিত মাধবচন্দ্র মল্লিক এখানে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন, এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমরা চারি পাঁচ জন আত্মীয় কখন কখনও তাঁহার বাসায় আহারের সঙ্গে মৃদু মদিরা পান করিতাম এবং বড়ই সুখী হইতাম"।

ইহাতেই সকলে অনুভব করিতে পারিবেন, এদেশের ভদ্রলোকের মধ্যে সুরাপানটা কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং যাঁহারা প্রথমে এই পথের পথিক হন, তাঁহারা কি ভাবে সে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহাকে কুসংস্কার-ভঞ্জন ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায় মনে করিতেন। ডিরোজিওর শিষ্যগণ এই ভাবেই ইহাকে অবলম্বন করেন।

ক্রমে রামতনু লাহিড়ী মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। হিন্দু-কালেজে পাঠকালে তিনি শ্যামপুকুরের বাসা পরিত্যাগ করিয়া পাথুরিয়াঘাটাতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৈঠকখানার সন্নিকটে, আপনার জ্যেষ্ঠতাত ঠাকুরদা

লাহিড়ী মহাশয়ের প্রবাস-ভবনে গিয়া অবস্থিত হন। এই ঠাকুরদাস লাহিড়ী মহাশয়ের বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। ইনি কলিকাতাতে নদীয়া রাজের প্রতিনিধিরূপে বাস করিতেন। তখন লোকে ইঁহাকে লাহিড়ী দেওয়ান বলিয়া ডাকিত। ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের সহিত নদীয়া রাজের যে সমুদয় কারবার ছিল, তাহা ইনিই নিষ্পন্ন করিতেন। ইনিও দেওয়ানদিগের বাড়ীতে বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং মাতার দিক দিয়া ইহাঁর সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখানে লাহিড়ী মহাশয় যে অধিককাল ছিলেন এরূপ বোধ হয় না; কারণ নিজে ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিবার পূর্ব্বে তিনি স্বীয় জননীর মামাত ভাই হরিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে কিছুদিন ছিলেন, এরূপ শুনিয়াছি।

প্রথম শ্রেণীতে একবৎসর পাঠ করিয়া তিনি ছাত্রবৃত্তির প্রার্থী হইলেন। তৎকালে কৃতী ছাত্রদিগকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বৃত্তি দেওয়া হইত। তিনি হেয়ারের নিকট বৃত্তি-প্রার্থী হইলে মহাত্মা হেয়ার তাঁহাকে কমিটী অব পবলিক ইনষ্ট্রক্শনের সেক্রেটারী ডাক্তার উইলসনের নিকট প্রেরণ করিলেন। ডাক্তার উইলসন সে সময়ে টাঁকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন; এবং জেম্‌স্ প্রিন্সেপ নামে একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ তাঁহার সহকারী ছিলেন। ডাক্তার উইলসন প্রিন্সেপের উপরে রামতনু বাবুকে পরীক্ষা করিবার ভার অর্পণ করিলেন। প্রিন্সেপ পরীক্ষা করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি ১৬ টাকা বৃত্তি পাইলেন।

বৃত্তি পাইয়াই তাহার মনে হইল যে রাধাবিলাস ও কালীচরণকে কলিকাতায় আনিয়া লেখা পড়া শিখাইতে হইবে। তদনুসারে কালেজের নিকটে স্বতন্ত্র বাসা করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে কলিকাতায় আনিলেন। এখনকার সহিত তুলনায় তখন কলিকাতা বাসের ব্যয় স্বল্পই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলেও ষোল টাকাতে তিন জনের বাসা করিয়া থাকা বড় সুসাধ্য ব্যাপার ছিল না। তাঁহারা যে প্রকার ক্লেশে দিন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, শুনিলে এখনকার ছাত্রগণের কিছু জ্ঞানলাভ হইতে পারে। বাসাতে পাচক বা ভৃত্য ছিল না; ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাজা, বাজার করা, কুটনা কোটা, বাঁটনা বাটা, রন্ধন করা প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য আপনাদিগকেই নির্ব্বাহ করিতে হইত; প্রাতে ও রাত্রে দুইবার মাত্র আহার, মধ্যাহ্নে জল খাবারের পয়সা যুটিত না; কাহারও পায়ে জুতা ছিল না; সকলেই পাদুকাহীন পদে স্কুলে যাইতেন। ইহার উপরে আবার এই সময় হইতে কেশব চন্দ্রের সাহায্য রহিত হইয়াছিল।

কেন রহিত হইয়াছিল বলিতে পারি না; বোধ হয় কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে বিবাহাদি দ্বারা পরিবার বৃদ্ধি হওয়াতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন, যে তিনি এক এক সময়ে এরূপ অর্থকৃচ্ছ্রের মধ্যে পড়িতেন যে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইতেন না। একবার তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ৭।৮ টাকা কর্জ্জ করিলেন। তৎপরে একবার নিরুপায় হইয়া মহাত্মা হেয়ারের শরণাপন্ন হইতে হইল। হেয়ার, কাহাকেও বলিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া, তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন। তিনি হেয়ারের জীবদ্দশাতে এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই।

এই হিন্দুকালেজের শিক্ষার সময়ের আর একটী স্মরণীয় ঘটনা আছে। এই সময়ে একবার তিনি বিষম ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। হেয়ার সংবাদ পাইবামাত্র আসিয়া নিজেই তাঁহার চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন। হেয়ারের নিকট নানাপ্রকার ঔষধ সর্ব্বদাই থাকিত। একদিন হেয়ার সন্ধ্যার পর রোগীর সংবাদ না পাইয়া অধিক রাত্রে লালদিঘীর নিকট হইতে হাঁটিয়া, এক জঘন্য, দুর্গন্ধময় গলির ভিতর রামতনু বাবুর বাসাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথমে বাসার লোকে তাঁহার কণ্ঠস্বর ও ইংরাজী ভাষা শুনিয়া মনে করিল, বুঝি কোনও মাতাল গোরা দ্বারে আঘাত করিতেছে, তাই দ্বার খুলিতে বিলম্ব করিতে লাগিল। হেয়ার তাহা বুঝিতে পারিয়া হিন্দীতে বলিলেন—"ডরো মত, হাম হেয়ার সাহেব হায়।" তখন তাহারা দ্বার খুলিল।

হায় হায়! মানব-প্রেমিক হেয়ার এই বালকদিগকে যেরূপ ভালবাসিতেন, এবং তাহাদের জন্য যাহা করিতেন, পিতা মাতাও তাহার অধিক করে না।

এই সময়েই ইহার অনুরূপ আর একটী ঘটনা ঘটে। একবার হিন্দুকালেজের একটী ছাত্র, চন্দ্রশেখর দেব, একদিন সন্ধ্যাকালে গ্রে সাহেবের ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আবার মুষলধারাতে বৃষ্টি নামিল। হেয়ার বালকটীকে ছাড়িলেন না। নিজের মিঠাইওয়ালার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে মিঠাই খাওয়াইলেন; এবং নিজে ইত্যবসরে আহার করিয়া লইলেন। তৎপরে বৃষ্টি থামিলে বলিলেন;—"চল তোমাকে একটু আগাইয়া দিয়া আসি, পথে গোরারা আছে তোমাকে একেলা যাইতে দিতে পারি না!" এই বলিয়া এক গাছি মোটা লাঠি লইয়া চন্দ্রশেখরের সমভিব্যাহারী হইলেন।

বহুবাজারের মোড়ে আসিয়া চন্দ্রশেখর বলিলেন—"আপনি আর আসিবেন না"; হেয়ার বলিলেন;—"না, চল মাধব দত্তের বাজারের নিকট দিয়া আসি।" আবার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কালেজের দীঘির কোণে আসিয়া বলিলেন—"আমি দাঁড়াইতেছি তুমি যাও।" চন্দ্রশেখর চলিয়া গেল। সে বালক তখন পটুয়াটোলা লেনে থাকিত। বালকটী আসিয়া দ্বার দিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতেছে এমন সময়ে শোনা গেল কে দ্বারে আঘাত করিতেছে; লোকে দেখিল হেয়ার। হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন,—Is Chunder in?" চন্দ্র কি পৌঁছিয়াছে?" হায় সে প্রেম কিরূপ যাহা এতদূর বালকটীর সঙ্গে আসিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না, আবার ভাবে—ছেলেটা ঘরে পৌঁছিল কি না একবার দেখি।

এই উদারচেতা সহৃদয় পুরুষের তত্ত্বাবধানে রামতনু হিন্দুকালেজে পড়িতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা।

অতঃপর আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইতেছি। ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিংশতিবর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিকেই নবযুগের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। তাহার ক্রম কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

ইংরাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া কিরূপে রাজা হইয়া বসিলেন, সে ইতিবৃত্ত আর বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বণিকদিগের মনে রাজভাব প্রবেশ করা, ইহা দুই দশ দিনে ঘটে নাই। যতদিন তাঁহারা বণিক ছিলেন, ততদিন ভাবিতেন এদেশের লোকের সুখ দুঃখের সঙ্গে, উন্নতি অবনতির সঙ্গে, আমাদের সম্বন্ধ কি? আমরা বৈধ অবৈধ যেরূপ উপায়েই হউক এখান হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া লইয়া দেশে যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ। এইভাব কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষের মনে এবং

ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সমুদয় কর্ম্মচারীর মনে বহুদিন প্রবল ছিল। প্রথম প্রথম কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ এরূপ স্বল্প বেতন পাইতেন যে, সেরূপ স্বল্প বেতনে ভদ্রলোক এত দূরদেশে আসে না। কিন্তু অবৈধ অর্থোপার্জ্জনের উপায় এত অধিক ছিল যে, তাহার প্রলোভনে লোকে এদেশে আসিতে ব্যগ্র হইত। এই সকল কর্ম্মচারীর অধিকাংশকে ফ্যাক্টর বা কুঠীওয়াল বলিত। কুঠীওয়ালগণ কোম্পানির কুঠী সকলের পরিদর্শন করিতেন, বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, হিসাব পত্র রাখিতেন এবং বিবিধ প্রকারে কোম্পানির সওদাগরী কার্য্যের সহায়তা করিতেন।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি যখন দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগকে লইতে হইল। ফৌজদারী কার্য্যের ভার মুরশিদাবাদের মুসলমান গবর্ণমেণ্টের হস্তেই থাকিল। যখন রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হস্তে আসিল, তখন কোম্পানির কুঠীওয়াল-গণই কালেক্টর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানির এজেণ্টের ন্যায় সওদাগরীর তত্ত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেক্টরের কাজও করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিল না। যেরূপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাবটা তাঁহাদের মনে প্রবল থাকিল। আমরা দেশের রাজা, প্রজাদিগের সুখ দুঃখের জন্য আমরা দায়ী, এভাব তাঁহাদের মনে প্রবেশ করিল না। প্রমাণ স্বরূপ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অগ্রেই বলিয়াছি নবপ্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন প্রজাকুলের দুর্ভিক্ষ-ক্লেশ নিবারণের জন্য কিছুই করেন নাই। কেবল তাহা নহে; ইহা স্মরণ করিতেও ক্লেশ হয় যে দুর্ভিক্ষের বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রজা-সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তথাপি রাজস্বের এক কপর্দ্দকও ছাড়া হয় নাই। সে বৎসরে যাহা আদায় হইতে পারে নাই পর বৎসরে সে সমগ্র আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তদানীন্তন গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাহাদুর ১৭৭২ সালের ৩রা নবেম্বর দিবসে ইংলণ্ডের কর্ত্তৃ-পক্ষকে যে পত্র লেখেন তাহাতে রাজস্ব আদায়ের নিম্নলিখিত তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭৬৮-৬৯ সালে ১৫২৫৪৮৫৬ টাকা; ১৭৬৯-১৭৭০ সালে ১৩১৪৯১৪৮ টাকা; ১৭৭০-৭১ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের বৎসরে ১৪০০৬০৩০ টাকা; এবং ১৭৭১-৭২ সালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের পর বৎসরে, ১৫৭২৬৫৭৬ টাকা। তবেই দেখা যাইতেছে তন রাজগণ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাবৃন্দের রক্ত-

শোষণ করিতে ছাড়েন নাই। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, দুর্ভিক্ষের বৎসরে প্রজা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যদি কালগ্রাসে পতিত হইল, তবে পর বৎসরে এত রাজস্ব আদায় হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে হেষ্টিংস বাহাদুর তাঁহার পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"It was naturally to be expected that the diminution of the revenue should have kept an equal pace with the other consequences of so great a calamity. That it did not was owing to its being violently kept up to its former standard. To ascertain all the means by which this was effected will not be easy. * * * * One tax, however, we will endeavour to describe, as it may serve to account for the equality which has been preserved in the past collections, and to which it has principally contributed. It is called Najay, and it is an assessment upon the actual inhabitants of every inferior description of lands to make up for the loss sustained in the rents of their neighbours, who are either dead or fled from the country."

অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়া রাজস্বের যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের নিকট হইতে শুদে আসলে বলপূর্ব্বক আদায় করা হইয়াছিল। এই ব্যবহারের স্বপক্ষে হেষ্টিংস বাহাদুর এইমাত্র বলিয়াছেন যে এরূপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল, এবং গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎভাবে এ প্রকারে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ করেন নাই। কিন্তু ইহাতে সংশয় নাই, তাঁহারা অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগকে রাজস্বের এক কপর্দ্দকও ছাড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন; এবং এইরূপ গর্হিত উপায়ে রাজস্ব আদায় হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার মূল বক্তব্য এই যে ইংরাজগণ দেশের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও বহুদিন রাজার দায়িত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই। রাজার দায়িত্ব বুঝিলে প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার সম্ভব নয়। গ্রামের একজন সামান্য জমিদার যাহা করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহারা করেন নাই। দেশীয় রাজগণ সর্ব্বদাই দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিপদের সময় রাজস্ব রেহাই দিয়া থাকেন এবং এখনও দিতেছেন। আমাদের বাস-গ্রামে জনশ্রুতি আছে, একবার দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামের জমিদারগণ পর্ব্বত সমান অন্নের স্তূপ, ও

শালতী ভরিয়া ডাল রাঁধিয়া শত শত দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাকে বহুদিন আহার করাইয়া বাঁচাইয়াছিলেন।

এইরূপে বণিকগণের রাজা হইয়া বসিতে ও রাজার কর্ত্তব্য সকল হৃদয়ে ধারণ করিতে অনেক দিন গেল। অপর দিকে প্রজাদিগেরও নূতন রাজাদিগের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিল। প্রথম প্রথম এদেশের লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজেরা এদেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবেন কি না? পলাশীর যুদ্ধে তাঁহারা দেশ জয় করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে অন্তর্বিদ্রোহ চলিল। একদিকে মুসলমান নবাবদিগের সহিত বিবাদ, অপরদিকে পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ও পূর্ব্বে মগদিগের সহিত বিরোধ চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যেও বিষ্ণুপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে দলে দলে বিদ্রোহী দেখা দিতে লাগিল। ১৮২৫ সালের মধ্যে এই সকল উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদেশীয়গণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে ইংরাজরাজ্য স্থায়ী হইল, এবং তাঁহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নূতন রাজাদিগের প্রয়োজনানুসারে গঠিত হইতে হইবে। ইংরাজ-রাজপুরুষগণও হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন যে ভারত-সাম্রাজ্য বহুবিস্তীর্ণ হইতে যাইতেছে; এবং সেই সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার তাঁহাদের মস্তকে।

রাজা ও প্রজা উভয়ের মনে এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়া উভয় শ্রেণীর মনে একই প্রশ্নের উদয় হইল। রাজারা ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এদেশ শাসন করি, প্রাচীন বা নবীন রীতি অনুসারে? প্রজাগণও চিন্তা করিতে লাগিলেন, কাহাকে এখন আলিঙ্গন করি;—প্রাচীনকে বা নবীনকে? ১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ সাল পর্য্যন্ত বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত উভয় প্রশ্নের বিচার ও মীমাংসা হইয়াছিল বলিয়া ঐ কালকে বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছি। যেরূপে মীমাংসা হইয়াছিল তাহা পরে নির্দ্দেশ করিতেছি।

নূতন রাজারা যতদিন এদেশ ও এদেশবাসীদিগকে বুঝিয়া লইতে পারেন নাই, ততদিন কোনও বিভাগেই লঘুভাবে প্রাচীনকে বিপর্য্যস্ত করেন নাই। সর্ব্ববিভাগেই ভয়ে ভয়ে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ করিয়াছেন। রাজনীতি বিভাগে সর্ব্বাগ্রে দেশীয় কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা, দেশীয় রীতিতেই, সকল কার্য্য করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম প্রথম এক একজন এদেশীয় নায়েব-দেওয়

নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন। কিন্তু বহুকালের পরাধীনতাজাত দায়িত্ব-হীনতা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের এমনি দুর্গতি হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে এই নায়েব দেওয়ানগণ মনে করিতেন বিদেশীয়েরা ত বেশ লুটিয়া লইয়া যাইবে, আমরা লাভ লোকসানের ভাগী নই, সুতরাং আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি করিয়া লই; এইরূপে তাঁহাদের উৎপীড়ন ও উৎকোচাদিতে লোকে এত জ্বালাতন হইয়া উঠিল যে অবশেষে সে সকল পদ তুলিয়া দিতে হইল। ক্লাইবের নায়েব-দেওয়ান গোবিন্দ রামের ও হেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কথা অনেকেই অবগত আছেন। এইরূপে কিছুদিন গেল; শেষে, লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর এদেশীয়দিগকে উচ্চ উচ্চ পদ হইতে অপসারিত করিয়া সেই সকল পদে ইউরোপীয়দিগকে স্থাপন করিলেন। তখন হইতে এদেশীয়গণ সর্ব্ববিধ উচ্চপদ হইতে চ্যুত হইয়া হীন-দশায় পতিত হইলেন। তৎপরে ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত এদেশীয়দিগের শেরেস্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিল না। এই কালকে এদেশীয়দিগের প্রকৃত পতনের কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ এই সময় হইতেই এদেশীয়গণ সর্ব্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকৃত হইয়া উন্নতির সম্ভাবনা ও তজ্জনিত উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে বিদূরিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন। এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুদ্রাশয়তার গর্ত্তে এদেশীয়গণ এখনও পড়িয়া রহিয়াছেন। এই লক্ষ্য, চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষুদ্রতাকে পরাধীনতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোচনীয় ফল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। কারণ কোনও জাতি কিছুকাল এই অবস্থাতে বাস করিলে তাহাদের জাতীয় জীবন হইতে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভের স্পৃহা বিলুপ্ত হইয়া যায়।

আইন আদালত সম্বন্ধে ও রাজারা ভয়ে ভয়ে বহুকাল যথাসাধ্য প্রাচীন রীতি রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ইহা অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা ও এদেশীয় আইন প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বহু বৎসর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক একজন হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী রাখার নিয়ম হয়; তাঁহারা এদেশীয় আইনের ব্যাখ্যা করিয়া জজের সাহায্য করিতেন।

শিক্ষা বিস্তার বিষয়েও তাঁহারা যে বহুবৎসর প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন তাহাও পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি। এমন কি এদেশীয়দিগকে চিকিৎসাশাস্ত্র শিখাইবার জন্য কিছুদিন সংস্কৃত কালেজের সঙ্গে চরক সুশ্রুতের ক্লাস ও মাদ্রা-

সার সঙ্গে আবিসেন্নার ক্লাস রাখা হইয়াছিল। ইহার বিবরণ পরে বিস্তৃতরূপে দেওয়া যাইবে।

অতএব ইহা নিশ্চিত যে ইংরাজগণ লঘুভাবে প্রাচীনের প্রতি হস্তার্পণ করেন নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক প্রকৃষ্ট রাজনীতি বোধে, তাঁহারা প্রারম্ভে সর্ব্ববিষয়ে প্রাচীনকে রক্ষা করিয়াই চলিতেন। এই সন্ধিক্ষণের মধ্যে মহা তর্ক-বিতর্কের পর প্রাচীনকে বিপর্য্যস্ত করিয়া নবীনের প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইংরাজ পক্ষে মেকলে ও বেণ্টিঙ্ক এই নবযুগের সারথি হইয়াছিলেন।

এই অন্দোলন এদেশীয়দিগের মনেও উঠিয়াছিল। তাঁহারাও এই সন্ধিক্ষণে বিচার করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইহার মধ্যে কাহাকে বরণ করিবেন? তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে প্রাচীনকে বর্জ্জন করিয়া নবীনকেই বরণ করিতে হইবে। দেশীয় পক্ষে রামমোহন রায়, ডেবিড হেয়ার ও ডিরোজিও এই পুরুষত্রয় সারথ্য কার্য্যের ভার লইয়াছিলেন।

রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি মনে করা যাইতে পারে। তিনি যেন স্বদেশবাসীদিগের মুখ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে ফিরাইয়া দিলেন। তবে ইহা স্মরণীয় যে তাঁহাতে যাহা ছিল অপর কোনও নেতাতে তাহা হয় নাই। তিনি নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ত্ব তিনি তাহা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, এবং তাহা সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্যনীতি ও পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সামাজিক সকল প্রকার বিপ্লবেরই একটা ঘাত প্রতিঘাত আছে। প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ এক দিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণ ও অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গিয়াছিলেন। যাহা কিছু প্রাচীন সকলি মন্দ, এবং যাহা কিছু নবীন সকলি ভাল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। ইহার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল পরে নির্দ্দেশ করিতেছি।

এই নবীনে অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিল। ফরাসি বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাঁহারা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের

গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মন ও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসিবিপ্লব-জনিত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন, এবং ঐ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাঁহাদের মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্ম্ম ও প্রাচীন প্রথা ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, এই তাঁহাদের মনের ভাব দাঁড়াইল। ইহাও অতিরিক্ত পাশ্চাত্য পক্ষপাতিত্বের অন্যতম কারণ। ফরাসি-বিপ্লবের এই আবেগ বহুবৎসর ধরিয়া বঙ্গসমাজে কার্য্য করিয়াছে; তাহার প্রভাব এই সুদূর পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়াছে।

যে ১৮২৮ সালের মার্চ্চমাসে ডিরোজিও হিন্দুকালেজের শিক্ষক হইয়া আসিলেন, সেই মার্চ্চমাসেই তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহার্ষ্ট এদেশ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার পদাভিষিক্ত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক সমুদ্রপথে আসিতেছেন। পরবর্ত্তী জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এদেশে পৌছিলেন। বঙ্গে মণিকাঞ্চনের যোগ হইল। একদিকে রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, এবং নবপ্রবর্ত্তিত ইংরাজী শিক্ষার উন্মাদিনী শক্তি, অপরদিকে বেণ্টিক বাহাদুরের শুভাগমন,—বিধাতা যেন সময়োপযোগী আয়োজন করিলেন।

এই নবযুগের প্রবর্ত্তনের সময় সর্ব্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত রাজপুরুষের যে দুইটী সদ্‌গুণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কে সেই গুণদ্বয় পূর্ণমাত্রাতে বিদ্যমান ছিল। তাঁহাতে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে ধীরচিত্ততা, বিচারশীলতা, সকল দিক দেখিয়া কাজ করিবার প্রবৃত্তি, যেমন দেখা গিয়াছিল, কর্ত্তব্য পথ একবার নির্দ্ধারিত হইলে তদবলম্বনে দৃঢ়চিত্ততা তেমনি দৃষ্ট হইয়াছিল। সহমরণ নিবারণ, ঠগীদমন, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, মেডিকেল কালেজ স্থাপন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্যে তাঁহার গুণের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। তিনি এদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহায় হইবেন এই সংকল্প করিয়া রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে সপ্ত বৎসর গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক এদেশে পদার্পণ করিলে রামমোহন রায়ের কার্য্যোৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাঁহার বন্ধু উইলিয়াম এডাম খ্রীশ্বর বাদ

পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বর-বাদী হওয়ার পর তাঁহাকে শ্রীরামপুরের বাপ্তিষ্ট-মিশনারিগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। তদবধি শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ রামমোহন রায়ের প্রতি জাতক্রোধ হন; এবং বৈরভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। এই উপলক্ষে খ্রীষ্টীয়দিগের সহিত রামমোহন রায়ের ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায় উপর্য্যুপরি Precepts of Jesus, Appeals to the Christian public, Brahmanical Magazine প্রভৃতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। অগ্রে হিন্দুগণ তাঁহার বিরোধী ছিলেন, এক্ষণে খ্রীষ্টীয়গণও বিরোধী হইলেন। রামমোহন রায় কিছুতেই স্বীয় অভীষ্টপথ পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন না। মিশনারিগণ আপনাদের প্রেসে তাঁহার লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অস্বীকৃত হইলে, তিনি ধর্ম্মতলাতে "ইউ-নিটেরিয়ান প্রেস" নামে একটী প্রেস স্থাপন করিলেন; হরকরা নামক তদানীন্তন ইংরাজী সংবাদ পত্রের আফীস গৃহের উপরতালায় তাঁহার বন্ধু এডামের জন্য সাপ্তাহিক উপাসনার ব্যবস্থা করিলেন; আচার্য্যরূপে এডামের ভরণ পোষণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং স্বীয় সন্তানগণ ও বন্ধুগণ সহ তাঁহার উপাসনালয়ে গতায়াত করিতে লাগিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে, যে বন্ধুবর এডামের জন্য রামমোহন রায় দশ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ইহা তিনি নিজে দিয়াছিলেন কি চাঁদা তুলিয়া দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। বোধ হয় ইহার অধিকাংশ তাঁহার প্রদত্ত ও অপরাংশ বন্ধুদিগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন।

লর্ড আমহার্ষ্ট বাহাদুরের রাজত্বের প্রারম্ভেই সহমরণ নিবারণের জন্য যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা এই ১৮২৮ সালেও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। সে বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত জানা, ইংলণ্ডের প্রভুদিগের সহিত চিঠী পত্র লেখা, নানা স্থান হইতে সহমরণ প্রথা সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করা হইতেছিল। তৎকালের নিজামত আদালতের কোর্টনি স্মিথ, (Courtney Smith) আলেকজণ্ডার রস (Alexander Ross) আর, এইচ্, রাট্রে (R. H. Rattray) প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ প্রথা নিবারণের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন কোনও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী সতর্কতার পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিয়াছিলেন যে প্রথমে নন-রেগুলেশন প্রদেশে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, প্রজারা সহ্য করে কি না। এই সকল সংবাদ ও মত সংগ্রহ করিতে ১৮২৭ সাল অতীত হইয়া গেল। ১৮২৮ সালের

প্রারম্ভে লর্ড আমহার্ষ্ট লিখিলেন—"I think there is reason to believe and expect that, except on the occurrence of some very general sickness, such as that which prevailed in the lower parts of Bengal in 1825, the progress of general instruction and the unostentatious exertions of our local officers will produce the happy effect of a gradual diminution, and at no very distant period, the final extinction of the barbarous rite of suttee."—অর্থাৎ এরূপ আশা করা যায় যে শিক্ষা বিস্তারের গুণে ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের চেষ্টায় অচিরকালের মধ্যে এই নৃশংস প্রথা তিরোহিত হইবে। বলা বাহুল্য গবর্ণর জেনেরালের এইরূপ মীমাংসা রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। তাঁহারা এ বিষয়ে আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। এখন তাঁহাদের প্রধান কার্য্য এই হইল যে, কোনও স্থানে কোনও রমণী সহমৃতা হইতেছেন এই সংবাদ পাইলেই কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে এই প্রথাকে দমনে রাখিবার জন্য যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিপালিত হইল কি না তাঁহারা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, সে কারণে তাঁহারা দলে দলে সহমরণের স্থলে উপস্থিত থাকিতেন। এই চেষ্টা এ প্রথা দমনের পক্ষে অনেক সহায়তা করিতে লাগিল।

এই বৎসরের (১৮২৮ সাল) ৬ই ভাদ্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতার চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বসু নামক এক ভদ্রলোকের বাহিরের বৈঠকখানা ভাড়া লইয়া সেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। একদিন রবিবার রামমোহন রায় বন্ধুবর এডামের উপাসনা হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন। তখন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাঁহার গাড়িতে ছিলেন। পথিমধ্যে চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন,—'দেওয়ানজী বিদেশীয়ের উপাসনাতে আমরা গতায়াত করি, আমাদের নিজের একটা উপাসনার ব্যবস্থা করিলে হয় না? এই কথা রামমোহন রায়ের মনে লাগিল। তিনি কালীনাথ মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্মীয়-সভায় বন্ধুগণকে আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতি-ক্রমে সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার্থ একটী বাড়ী ভাড়া করা স্থির হইল। তদনুসারে উক্ত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মোপাসনা হইত। কার্যপ্রণালী

এইরূপ ছিল, প্রথমে দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেন। তৎপরে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করিতেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উপদেশ প্রদান করিলে সংগীতানন্তর সভা ভঙ্গ হইত। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী এই প্রথম সমাজের সম্পাদক ছিলেন।

ব্রহ্মসভা স্থাপিত হইলে কলিকাতার হিন্দুসমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল। তাঁহাদের অনেকে রামমোহন রায়ের সভার কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনের জন্য সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন তাহা নহে, সামাজিক বিষয়ে তাঁহার আচার ব্যবহার হিন্দুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিল। এই সকল বিষয় লইয়া পথে ঘাটে, বাবুদের বৈঠকখানায়, রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্ব্বদা কটূক্তি বর্ষণ হইত।

যখন একদিকে এই সকল বাগ্‌বিতণ্ডা ও আন্দোলন চলিতেছে তখন হিন্দুকালেজের মধ্যে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা দৃষ্ট হইল। ডিরোজিও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিয়াই, চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে, সেইরূপ কালেজের প্রথম চারিশ্রেণীর বালককে কিরূপ আকৃষ্ট করিয়া লইলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ সম্বন্ধ, কেহ কখনও দেখে নাই। ডিরোজিও তিন বৎসর মাত্র হিন্দুকালেজে ছিলেন, কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার শিষ্যদলের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়া দিলেন যাহা তাঁহাদের অন্তরে আমরণ বিদ্যমান ছিল। তাঁহাদের অনেকেই উত্তরকালে এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি যে বিভাগেই গিয়াছিলেন, কেহই ডিরোজিওর শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অপরাপর প্রধান প্রধান শিষ্যের পরিচয় পরে দিব, একজনের বিষয় সাধারণের জ্ঞাত নহে এই জন্য কিছু বলিতেছি।

একবার বোম্বাই প্রদেশে গিয়া তথাকার প্রার্থনাসমাজের সুযোগ্য ও সম্মানিত সভ্য পরকালগত নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে তাঁহাদের যৌবনকালে বোম্বাই সহরে এক অদ্ভুত সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার অবলম্বিত নামটী এখন বিস্মৃত হইয়াছি। তিনি ইংরাজী ভাষাতে সুশিক্ষিত ছিলেন। সন্ন্যাসী বোম্বাই হইতে গুজরাটের অন্তবর্ত্তী কাটিওয়াড় প্রদেশে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ কোনও সংবাদপত্রে Misgovernment at Katiwad"—"কাটিওয়াড়ে অরাজকতা" নাম দিয়া পত্র সকল মুদ্রিত হইতে

লাগিল। ঐ সকল পত্রে এমন বিজ্ঞতা, রাজনীতিজ্ঞতা, ও লোকচরিত্রদর্শনক্ষমতার পরিচয় ছিল যে, কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে চতুর্দ্দিকে সেই চর্চ্চা উঠিয়া গেল। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিও সে দিকে আকৃষ্ট হইল। কাটিওয়াড়ের রাজা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন কে এই সকল পত্র লিখিতেছে। ক্রমে সন্ন্যাসী ধরা পড়িলেন। সন্ন্যাসী কিছুই গোপন করিলেন না; রাজাকে বলিলেন,—"আপনার প্রজারা আমার নিকট আসিয়া কাঁদে, তাই তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া লিখিয়াছি, ইচ্ছা হয় আপনি শাসনকার্য্যের উন্নতি করুন, নতুবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।" রাজা সন্ন্যাসীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। সন্ন্যাসী একবর্ষকাল কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। এদিকে দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিল। একবর্ষ পরে রাজা সন্ন্যাসীকে কারামুক্ত করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—"আমার রাজপদের লালসা নাই, থাকিলে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিব কেন? তবে মহারাজ যদি দেশ সুশাসন করিতে চান, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারি।" তদবধি সন্ন্যাসীর রাজত্ব আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসী প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে "পুরাতন উৎকোচগ্রাহী কর্ম্মচারীদিগকে পদচ্যুত করিয়া তৎ তৎ পদে ইংরাজী-শিক্ষিত ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-কলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে।" তদনুসারে সন্ন্যাসী বোম্বাই সহরে আসিলেন, এবং একদল ইংরাজী-শিক্ষিত কর্ম্মচারী লইয়া গেলেন। নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তাঁহারা প্রায় এক বৎসরকাল সন্ন্যাসীর অধীনে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে পূর্ব্বপদচ্যুত কর্ম্মচারীদিগের চক্রান্তে রাজার আবার মতিভ্রম হইল, এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে সন্ন্যাসীর দলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাটিওয়াড় ছাড়িয়া যাইতে হইবে। তদনুসারে সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহারা সকলে চলিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি সন্ন্যাসী তাঁহাদের নিকট তাঁহার গুরু ডিরোজিওর নাম সর্ব্বদা করিতেন এবং তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতেন। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া রামতনু লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাঁহাদের দলের মধ্যে কে সন্ন্যাসব্রত লইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন, তিনি বলিতে পারিলেন না।

ডিরোজিওর কার্য্য গ্রহণের পর একবৎসর যাইতে না যাইতে তাঁহার শিষ্যগণ এক ঘননিবিষ্ট দলে পরিণত হইয়া পড়িলেন। এই ১৮২৮ সালের মধ্যেই

শিষ্যদলের মনের উপরে ডিরোজিওর কি প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহার বিবরণ তৎকালীন কালেজের কেরাণী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে ডিরোজিওর জীবনচরিত লেখক মিঃ এডোয়ার্ডাস্ কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়;—

"The students of the first, second, and third classes had the advantage of attending a conversazione established in the school by Mr. Derozio, where readings in poetry, and literature, and moral philosophy were carried on. The meetings were held almost daily after or before school hours. Though they were without the knowledge or sanction of the authorities yet Mr. Derozio's disinterested zeal and devotion in bringing up the students in these subjects was unbounded, and characterised by a love and philanthropy which, up to this day, has not been equalled by any teacher either in or out of the service. The students in their turn loved him most tenderly; and were ever ready to be guided by his counsels and imitate him in all their daily actions in life. In fact, Mr. Derozio acquired such an ascendancy over the minds of his pupils that they would not move even in their private concerns without his counsel and advice. On the other hand, he fostered their taste in literature; taught the evil effects of idolatry and superstition; and so far formed their moral conceptions and feelings, as to place them completely above the antiquated ideas and aspirations of the age. Such was the force of his instructions, that the conduct of the students out of the College was most exemplary and gained them the applause of the outside world, not only in a literary or scientific point of view, but what was of still greater importance, they were all considered men of *truth*. Indeed, the *College boy* was a synonym for truth, and it was a general belief and saying amongst our countrymen, which, those that remember the time, must acknowledge, that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a college boy.

ডিরোজিও এইরূপ উপাদান লইয়া তাঁহার Academic Association একাডেমিক এসোসিএশনের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কিছুদিন

অন্য কোনও স্থানে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া, শেষে মাণিকতলার একটী বাটীতে অধিবেশন হইত। ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি ও উমাচরণ বসু নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্তা, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেবিড হেয়ার, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারি Col. Benson, পরবর্ত্তী সময়ের এডজুটাণ্ট জেনেরাল Col. Beatson, বিশপ কালেজের অধ্যক্ষ Dr. Mills প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন, এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।

এই সভায় অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও অসংকুচিত ভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ডিরোজিওর শিষ্যদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; এবং তাঁহারা অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি নীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল কিরূপ দাঁড়াইল তাহা পূর্ব্বোক্ত হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"The principles and practices of Hindu religion were openly ridiculed and condemned, and angry disputes were held on moral subjects; the sentiments of Hume had been widely diffused and warmly partonised * * * *. The most glowing harangues were made at Debating Clubs which were then numerous. The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings. The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state, and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people. The degradation of the female mind was viewed with indignation; the question at a very large meeting was carried unanimously that Hindu women should be taught; and we are assured of the fact that

the wife of one of the leaders of this movement was a most accomplished lady, who included amongst the subjects, with which she was acquainted, moral philosophy and mathematics."

হিন্দুকালেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদিগের এই সকল ভাব ক্রমে অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বৃদ্ধাদিগের সহিত বালকদিগের বিবাদ, কলহ, ও তাহাদিগের প্রতি অভিভাবকগণের তাড়না চলিতে লাগিল। ডেবিড় হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন,—"ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত; অনেকে সন্ধ্যা আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকের পরিবর্ত্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত"। আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত। তাহারা রাজপথে যাইবার সময়, মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিবার জন্য "আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো" বলিয়া চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনের ছাদের উপরে উঠিয়া প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, "এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি" এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত।

তখন সহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া কোশাকুশি হস্তে ধনীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে বলিয়া বেড়াইত যে ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্ত্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে দোষ নাই; দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে সহরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। হিন্দুকালেজের কমিটী প্রথমে হেড মাষ্টার ডি, আন্‌সলেম সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন, যেন মাষ্টারেরা স্কুলের সময় বা অপর সময়ে বালকদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন না করেন। হেড মাষ্টার ডিরোজিওর উপরে চটিয়া গেলেন। একদিন ডিরোজিও তাঁহার কার্য্যের বিবরণ দিবার জন্য হেড্ মাষ্টারের নিকট গেলেন, তখন মহাত্মা হেয়ার সেখানে দণ্ডায়মান। আন্‌সলেম সাহেব উক্ত

কার্য্যবিবরণের মধ্যে কিঞ্চিৎ খুঁত ধরিয়া ডিরোজিওকে মারিতে গেলেন। ডিরোজিও সরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আন্‌সলেম রাগিয়া হেয়ারকে খোসামুদে বলিয়া গালি দিলেন। হেয়ার হাসিয়া বলিলেন—"কার খোসামুদে?" হেয়ারের অপরাধ এই যে তিনি ডিরোজিওর শিক্ষাপ্রণালী অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে ভালবাসিতেন। হিন্দুস্কুল কমিটী আবার আদেশ করিলেন যে শিক্ষকেরা বালকদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনা করিতে পারিবেন না, এবং স্কুলঘরে খাবার আনিয়া খাইতে পারিবেন না।

একদিকে যখন এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে তখন অপর দিকে ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর মহামতি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ নিবারণ করিয়া নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিলেন :—

"It is hereby declared, that after the promulgation of this regulation, all persons convicted of aiding and abetting in the sacrifice of a Hindu widow by burning or burying her alive, whether the sacrifice be voluntary on her part or not, shall be deemed guilty of culpable homicide and shall be liable to punishment by fine or imprisonment or both by fine and imprisonment."—*Regulation of 4th December, 1829.*

ইহার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১১ই মাঘ দিবসে রামমোহন রায় তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে ব্রহ্মসভাকে স্থাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিনে সেই ভবনের ট্রষ্টডীড্ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া দেওয়া হইল যে ঐ ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের ব্যবহারার্থ থাকিবে; এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা হইবে; তদ্ভিন্ন তথায় কোনও পরিমিত দেবতার পূজা হইবে না।

উক্ত উভয় ঘটনাতে কলিকাতাবাসী হিন্দুগণকে অতিশয় উত্তেজিত করিয়া তুলিল। রাধাকান্ত দেব সারথি হইয়া ধর্ম্মসভা নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। মতিলাল শীল কলুটোলাতে তাহার এক শাখা ধর্ম্মসভা স্থাপন করিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পূর্ব্ব হইতেই চন্দ্রিকার সম্পাদক রূপে কার্য্য করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। যে দিন ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইত সে দিন সহরের ধনীদের গাড়িতে রাজপথ পূর্ণ হইয়া যাইত। সভাতে সমবেত সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে তাঁহারা অনেক দিন রাম মোহন রায়ের সভার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, আর উপেক্ষা

করিবেন না, এবার তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন। এই আক্রোশ কার্য্যেও প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারা রামমোহন রায়ের দলস্থ ব্যক্তিদিগকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এমন কি যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁহার দলস্থ লোকদিগের ভবনে বিদায় আদায় গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগকেও বর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে সমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া গেল। রামমোহন রায় অবিচলিত চিত্তে আপনার কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গিয়া উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে তিনি উপাসনা মন্দিরে আসিবার সময়ে পদব্রজে আসিতেন, ফিরিবার সময়ে নিজ গাড়িতে ফিরিতেন। গাড়িতে যাইবার সময় কোন কোনও দিন পথের লোকে ইট পাথর, কাদা ছুড়িয়া মারিত ও বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ির দ্বার টানিয়া দিতেন ও বলিতেন কোচম্যান হেঁকে যাও।" সতীদাহনিবারণ ও ব্রহ্মসভা স্থাপন নিবন্ধন কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের মন এমনি উত্তেজিত হইয়াছিল যে সতীদাহ-নিবারণ-বিষয়ক আইন রদ করিবার জন্য এক আবেদন পত্রে বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর হইতে লাগিল। রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ককে সহমরণ নিবারণের জন্য ধন্যবাদ করিবার উদ্দেশে যে অভিনন্দন পত্র লিখিলেন তাহাতে তাঁহার কতিপয় বন্ধু ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর করিলেন না।

এইরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। ইতি মধ্যে সুবিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিশনারি আলেকজাণ্ডার ডফ কলিকাতাতে পদার্পণ করিলেন। তখন রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন। ডফ রামমোহন রায়ের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অনুভব করিলেন যে এদেশে ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। তদনুসারে তিনি এক প্রকার স্কটলণ্ডস্থিত কর্ত্তৃপক্ষের অনভিমতে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন। রামমোহন রায় সে জন্য ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব-ব্যবহৃত ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাড়ী নামক বাটী স্থির করিয়া দিলেন; এবং প্রথম ছয়টি ছাত্র জুটাইয়া দিলেন। সেই কতিপয় ছাত্রের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পরে সহরের বড়লোক হইয়াছিলেন।

ডফ স্কুল স্থাপন করিয়া নবশিক্ষিত যুবকদলের নিকটে থাকিবার আশয়ে বর্ত্তমান হিন্দুকালেজের সন্নিকটে বাসা করিয়া বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন।

রামমোহন রায় ডফকে স্বীয় কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। কালেজের বালকেরা অনেকে ডফ ও ডিয়ালট্রির বক্তৃতাতে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহাও হিন্দুকালেজ কমিটীর পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা আদেশ প্রচার করিলেন যে কালেজের বালকগণ কোনও বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারিবে না। এই আদেশ প্রচার হইলে চারি দিকে লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোকের স্বাধীন চিন্তার উপরে এতটা হাত দেওয়া কাহারও সহ্য হইল না।

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে কালেজ কমিটীর হিন্দুসভ্যগণ ডিরোজিওকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় হিন্দুসভ্যগণের মুখ-পাত্র স্বরূপ হইয়া এক বিশেষ অনুরোধপত্র প্রেরণ করিয়া সভা ডাকিলেন। ঐ "সভায় এই প্রশ্ন উঠিল—ডিরোজিওর স্বভাব চরিত্র এরূপ কি না, এবং তাঁহার সংসর্গে বালকদিগের এরূপ অপকার হইতেছে কি না, যাহাতে তাঁহাকে আর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত বোধ হয় না? ডাক্তার উইলসন ও মহামতি হেয়ার ডিরোজিওর সপক্ষে মত দিলেন, এবং হিন্দুসভ্যগণের অনেকেও এতটা বলিতে প্রস্তুত হইলেন না। অবশেষে এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া আর এক ভাবে প্রস্তাব উপস্থিত করা হইল যে, দেশীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে কালেজের অনিষ্ট হইবে কি না? উইলসন ও হেয়ার দেশীয় সমাজের অবস্থা বিষয়ে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়া এ বিষয়ে সাহসের সহিত কিছু বলিতে পারিলেন না; সুতরাং কোনও পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন না। অধিকাংশের মতে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করা স্থির হইল।

ডাক্তার উইলসন ডিরোজিওকে এই সংবাদ দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহার প্রতি যে যে দোষারোপ করা হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। বলিলেন তিনি কখনই নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ দুই যুক্তি তুলিয়া বালকদিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে; ভ্রাতা ভগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এরূপ অদ্ভুত মত তিনি কখনও প্রচার করেন নাই; এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক, সেরূপ ব্যবহার কোনও বালকে দেখিলে তাহাকে সাজা দিয়াছেন।

ডিরোজিও কালেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইষ্ট ইণ্ডিয়ান নামক একখানি দৈনিক সংবাদ পত্র বাহির করিয়া তাহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। ঐ কাগজ স্বরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। ডিরোজিও কলিকাতার ফিরিঙ্গীদলের এক জন নেতা বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তৎপরে যে কয়েকমাস তিনি জীবিত ছিলেন, সে সময়ের মধ্যে ফিরিঙ্গীসমাজের উন্নতির জন্য যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তন্মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোনও কাজ হইত না। এইরূপে খাটিতে খাটিতে ১৮২১ সালের ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার তিনি দুরারোগ্য ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন তিনি রোগ-শয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার শিষ্যদল আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং দিন রাত্রি পড়িয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার জীবন রক্ষা হইল না। ২৪শে ডিসেম্বর প্রাণবায়ু তাঁহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ইহার পরে ইষ্টইণ্ডিয়ান কাগজ একজন অপদার্থ ইংরাজের হস্তে গেল। সে ব্যক্তি ডিরোজিওর মাতা ও ভগিনীকে ধনে প্রাণে সারা করিল। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহারা জন্মের মত সমাজসাগরবক্ষে চিরবিস্মৃতির তলে ডুবিয়া গেলেন। ডিরোজিও অন্তর্হিত হইলে কিছুদিন তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব চলিয়াছিল; এবং তদর্থ একটী কমিটীও গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কালাবর্ত্তে সকলি মিলাইয়া গেল! নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষা-গুরুর চিহ্নমাত্রও রহিল না।

ডিরোজিও হিন্দুকালেজ ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া গেলেন তাহা আর থামিল না। ১৮৩১ সালের ২৩ আগষ্ট তাঁহার শিষ্যগণ এক মহা বিভ্রাট বাঁধাইয়া বসিলেন। সে সময়ে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবনে ডিরোজিওর শিষ্যদলের একটা আড্ডা ছিল। উক্ত দিবস কৃষ্ণমোহনের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার যুবক বন্ধুগণ সেখানে জুটিলেন। তখন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান সৎসাহসের কর্ম্ম ছিল মুসলমানের রুটী, ও বাজার হইতে সিদ্ধ করা মাংস আনিয়া খাওয়া। সেইরূপ আহারের পর হাড়গুলি পার্শ্বস্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়া দিয়া যুবকদল চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ঐ গোহাড়, ঐ গোহাড়।" আর কোথায় যায়! সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার মার শব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন। যুবকদল যিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন

করিলেন। তৎপরে প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতামহ রামজয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ধরিয়া বসিল—"আপনার দৌহিত্রকে বর্জ্জন করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব না।" ব্রাহ্মণ স্বীয় দৌহিত্রের প্রতি কোপে অধীর হইয়া গেলেন। বেচারা কৃষ্ণমোহন এ সকলের কিছুই জানেন না। তিনি সান্ধ্যকালে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর আশ্রয় পাইলেন না। সে রাত্রে যান কোথায়, উপায়ান্তর না পাইয়া স্বীয় বন্ধু দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তখন কৃষ্ণমোহন ও রসিককৃষ্ণ মল্লিক হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কৃষ্ণমোহন এই বৎসরের মে মাস হইতে Inquirer নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই পত্রে তিনি নির্য্যাতনকারী হিন্দুগণের প্রতি উপহাস বিদ্রূপবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নব্যদলের সমরভেরী বাজিয়া উঠিল।

১৮৩২ সালের ২৮ আগষ্টের Inquirer পত্রিকাতে প্রকাশ হইল যে ডিরোজিওর শিষ্যদলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। মহেশ বাল্যকালে অত্যন্ত জেঠা, ইয়ার ও উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া বিদিত ছিলেন। একারণে রামগোপাল ঘোষ তাঁহার সঙ্গে বড় মিশিতেন না। কিন্তু ডিরোজিওর সংশ্রবে আসিয়া মহেশের জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মানুরাগ ও সচ্চরিত্রতাগুণে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলেন।

সেই ১৮৩২ সালেরই ১৭ই অক্টোবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি তখন এরূপ জনরব উঠিয়াছিল যে হিন্দুকালেজের সমুদয় ভাল ভাল ছাত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবে।

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুকালেজে শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরে রামমোহন রায় ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিলেন; এবং রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ও মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের পরামর্শে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চ উচ্চ পদ এদেশীয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য উন্মুক্ত হইল। ঐ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভা ভারতশাসনের উন্নতিবিধানের উদ্দেশে এক নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন। তাহার ৮৭ ধারাতে লিখিত হইল;—

"And be it enacted that no native of the said territories, nor any natural born subject of his Majesty resident therein, shall by reason only of his relgion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment, under the said Company."

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এদেশীয়গণ হাজার বড় হইলেও শেরেস্তাদার উর্দ্ধে উঠিতে পারিতেন না। এমন কি রামমোহন রায়ও এ পদের উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতবাসকালে এদেশ শাসন সম্বন্ধে যে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দেওয়ার বিষয়ে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই বিধি প্রচার হওয়ার পর সে দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর করা হইতে লাগিল। অতএব এই ১৮৩৩ সাল হইতে এদেশীয়দিগের বক্ষ হইতে একখান পাথর তোলা হইল। সুখের বিষয় সে সময় হইতে এদেশীয়দিগকে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা তাহার অপব্যবহার করেন নাই, প্রত্যুত ঐ সকল পদকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রামতনু লাহিড়ীর যৌবন-সুহৃদগণ বা নব্যবঙ্গের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষকশ্রেষ্ঠ ডিরোজিওর প্রতিভার জ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া হিন্দু-কালেজের যুবক ছাত্রগণ কিরূপে তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়াছিল, এবং তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিল আশা করি তাহা সকলে এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার তৎপূর্ব্বে বা তৎপরে বঙ্গদেশে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। বালকদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি যে তাঁহার দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়া ছিল তাহা এক প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা বিদ্যালয়ে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া তৃপ্ত না হইয়া তাঁহার ভবনে সর্ব্বদা গতায়াত

রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

(১১৫ পৃষ্ঠা)

করিত। অনেকে সেজন্য গুরুজনের হস্তে কঠিন নিগ্রহ সহ্য করিত তথাপি যাইতে বিরত হইত না। এই সকল বালকের চিত্তেই ডিরোজিওর প্রভাব প্রধানরূপে কার্য্য করিয়াছিল। ইহাদের সকলেই তাঁহার একাডেমিক এসোশিএসনের সভ্য হইয়াছিল; ইহাদের অনেকে রোগশয্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিল। রামতনু লাহিড়ী মহাশয় এই দলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি প্রতিভা বলে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামগোপাল ঘোষের সমকক্ষ ছিলেন না; বরং অনেক বিষয়ে ইঁহাদিগকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও উপদেষ্টার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও চরিত্রের গুণে লাহিড়ী মহাশয় ইঁহাদের সকলের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইঁহাদের সকল কার্য্যে তিনি সঙ্গে থাকিতেন; সকল চিন্তা ও শ্রমের অংশী হইতেন; এবং ডিরোজিওর উপদেশের অনুসরণে সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পঠদ্দশার পরে ও যৌবনের কার্য্যক্ষেত্রে ইঁহাদের বন্ধুতা অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল যৌবনে কেন ইঁহাদের অধিকাংশের সহিত বার্দ্ধক্যেও লাহিড়ী মহাশয়ের অতি গভীর প্রীতি ও প্রগাঢ় আত্মীয়তা বিদ্যমান ছিল। বাল্যের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ প্রগাঢ় বন্ধুতা বর্ত্তমান সময়ে অসম্ভব হইয়াছে।

অতঃপর লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদ্‌গণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনচরিত সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে যাইতেছি।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইনি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ও লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদ্‌গণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি। ১৮১৩ সালে কলিকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে বর্ত্তমান বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে মাতামহের আলয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইহাঁর মাতামহের নাম রামজয় বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতার তৎকালপ্রসিদ্ধ ধনী, যোড়াসাঁকো নিবাসী, শান্তিরাম সিংহের ভবনে সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই শান্তিরাম সিংহ মহাভারত-প্রকাশক সুবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতামহ। কৃষ্ণমোহনের পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার নিবাস ২৪ পরগণার নবগ্রাম নামক গ্রামে ছিল। জীবনকৃষ্ণ কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন; এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের দুহিতা শ্রীমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া শ্বশুরা-

লয়েই বাস করিতেন। সেখানে তাঁহার কৃষ্ণমোহন ব্যতীত আর দুইটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মে। পুত্র দুইটির নাম ভুবনমোহন, ইনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সর্ব্বকনিষ্ঠ কালীমোহন। ইনি কৃষ্ণমোহনের পদবীর অনুসরণ করিয়া পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কন্যাটীর শিবনারায়ণ দাসের লেন নিবাসী হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র মন্নুলাল চট্টোপাধ্যায় পরে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বংশবৃদ্ধি হওয়াতে জীবনকৃষ্ণের শ্বশুরালয়ে বাস করা ক্লেশকর হইয়া উঠিল। তিনি ক্রমে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরির লেনে একটী স্বতন্ত্র আবাসবাটী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি কুলীনের সন্তান, সেরূপ বিদ্যাসাধ্য কিছুই ছিল না, সুতরাং তাঁহাকে অতি ক্লেশে নিজ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। এরূপ শুনিয়াছি, পতিপরায়ণা স্বধর্ম্ম-নিরতা শ্রীমতী দেবী গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া বিশ্রামার্থ যে কিছু সময় পাইতেন, সেই সময়ে কাটনা কাটিয়া, বেটের দড়ি পাকাইয়া, পৈতার সুতা প্রস্তুত করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা পতির সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে অনেক সহায়তা হইত। সে সময়ে ভারতবন্ধু হেয়ার কালীতলাতে স্কুল সোসাইটীর অধীনে একটী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৮ কি ১৮১৯ সালে শিশু কৃষ্ণমোহন সেই পাঠশালাতে ভর্ত্তি হইলেন। হেয়ার তাঁহার পাঠশালাগুলির তত্ত্বাবধানকার্য্যে কিরূপ মনোযোগী ছিলেন, তাহা অগ্রে বর্ণনা করিয়াছি। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই কৃষ্ণমোহনের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে ১৮২২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সোসাইটীর স্কুলে, বর্ত্তমান সময়ে তন্নামপ্রসিদ্ধ হেয়ার স্কুলে, লইয়া গেলেন। ১৮২৪ সালে যখন মহাবিদ্যালয় বা হিন্দুকালেজ নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কালেজের নব-নির্ম্মিত গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কৃষ্ণমোহন স্কুলসোসাইটির অবৈতনিক ছাত্ররূপে হিন্দুকালেজে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার যেরূপ মনোযোগ ছিল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কোনও দিন তাঁহার উদরে অন্ন যাইত কোনও দিন বা যাইত না, কিন্তু সেজন্য কেহ তাঁহাকে বিষণ্ণ বা স্বকার্য্য-সাধনে অমনোযোগী দেখিতে পাইত না। এমন কি তিনি স্বীয় জননীর সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে একবেলা তিনি রন্ধন করিবেন, সে সময়ে মা নিজ শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিবেন। তিনি স্কুল হইতে

আসিয়া রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন; অথচ বিদ্যালয়ে কেহই তাঁহাকে শিক্ষা বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারিত না।

ডিরোজিও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিবামাত্র অপরাপর বালকের ন্যায় কৃষ্ণমোহনও তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তখন প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। ডিরোজিও তাঁহাকে স্বীয় শিষ্যদলের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। একাডেমিক এসোসিএশন্ যখন স্থাপিত হইল, তখন কৃষ্ণমোহন তাহার যুবকসভ্যগণের মধ্যে একজন নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। ১৮২৮ সালে তাঁহার পিতা বিষম কলেরা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ১৮২৯ সালে নবেম্বর মাসে তিনি হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলেই হেয়ার তাঁহাকে নিজ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ১৮৩১ সালে বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর Reformer "রিফরমার" নামে এক সংবাদ পত্র বাহির করেন; তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া উক্ত বৎসরের মে মাসে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Inquirer নামে এক কাগজ বাহির করেন। এই কাগজে তৎকালোচিত রীতি অনুসারে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করিতে ত্রুটী করিতেন না। এই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতিবিদ্বেষ তাঁহার অন্তরে বহুদিন ছিল। ১৮৫০ সালে তিনি একখানি বিদ্রূপপূর্ণ পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাধাকান্ত দেবকে গাধা কান্ত নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার ডফ এদেশে আসিলেন, এবং কালেজের সন্নিকটে বাসা লইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইহার বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি; এবং ঐ সকল বক্তৃতা শুনিতে যাওয়াতে হিন্দুকালেজের ডিরোজিওর শিষ্যগণ কালেজকমিটীর কিরূপ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি। কৃষ্ণমোহন বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে, ঐ সকল বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন এবং তদ্ভিন্ন ডফ ও ডিয়ালট্রির (Dealtry) বাসাতে গিয়া তর্কবিতর্ক করিতেন।

তৎপরে ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে যে ঘটনা ঘটিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হয় তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি।

কৃষ্ণমোহন গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া দক্ষিণারঞ্জনের ভবনে সে রাত্রে আদরে গৃহীত হইলেন। তিনি এই ভবনে ঠিক কতদিন ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। বোধ হয় তাঁহাকে কয়েক দিনের মধ্যেই এই আশ্রয় স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র বাসা করিতে হইয়াছিল। কারণ দক্ষিণারঞ্জনের

বন্ধুগণ তাঁহার ভবনে আসিলে, তাঁহার পিতা বিরক্ত হইতেন, এজন্য পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একবার দক্ষিণারঞ্জনের পিতা স্বীয় পুত্রের অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কোনও বন্ধুকে অপমান করাতে দক্ষিণারঞ্জন পিতৃগৃহ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তখন ডিরোজিও তাঁহাকে বুঝাইয়া নিবৃত্ত করেন। এই বন্ধু হয়ত কৃষ্ণমোহন।

যাহা হউক, গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া কৃষ্ণমোহন ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ কিছুতেই মন্দীভূত হইল না। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাঁহার Inquirer পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন; এবং অসংকোচে ডফ্, ডিয়েল্‌ট্রি প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় প্রচারকদিগের ভবনে গতায়াত এবং তাঁহাদের সহিত পানভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। ১৮৩২ সালের ২৮ আগষ্টের ইন্‌কোয়ারারে সংবাদ বাহির হইল, যে হিন্দুকালেজের অন্যতম ছাত্র ও কৃষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশ চন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতা সমাজে তুমুল আন্দোলন উঠিল। তৎপরবর্ত্তী অক্টোবর মাসের ১৭ই দিবসে কৃষ্ণমোহন স্বয়ং খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনি গৃহ-তাড়িত হওয়ার পর কিছু দিন কতিপয় ইউরোপীয়ের সহিত খুব মিশিতেন। তন্মধ্যে কাপ্তেন কর্ব্বিন (Captain Corbin) নামে একজন সেনাদল-ভুক্ত কর্ম্মচারী প্রধান ছিলেন। তাঁহার ভবনে তিনি তাঁহাদের সহিত সমবেত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন। এতদ্ভিন্ন সে সময়ে কর্ণেল পাউনি (Colonel Powney) নামক একজন খ্রীষ্টভক্ত কর্ণেল কলিকাতাতে ছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুগণের সহিত সমবেত হইয়া কৃষ্ণমোহন একবার ষ্টীমার যোগে সাগর দ্বীপে গিয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করিয়াছেন তাঁহার খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ ইহাদেরই প্রভাবে।

যাহা হউক ইহার পরে কৃষ্ণমোহনের জীবনে সংগ্রামের পর সংগ্রাম উন্নতির পর উন্নতি চলিতে লাগিল। তাঁহার প্রণয়িনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী প্রথমে তাঁহার সহচারিণী হইতে চান নাই। অবশেষে অনেক দিন অপেক্ষা করার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগ দিলেন। ১৮৩৭ সালে কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টীয় আচার্য্যের পদে উন্নীত হইলেন। তাঁহার প্রথম আচার্য্যের কার্য্য তাঁহার বন্ধু মহেশ চন্দ্র ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে। ১৮৩৯ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কালীমোহনকে নিজধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ঐ সালেই তাঁহার জন্য হেদুয়ার কোণে এক ভজনালয় নির্ম্মিত হইল। তিনি সেখানে থাকিয়া

রাম গোপাল ঘোষ।

(১১৯ পৃষ্ঠা)

B. Kar. Bee Press.

তাঁহার অবলম্বিত ধর্ম্ম যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইখানে অবস্থান কালে সুপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন; এবং তাহার কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন।

১৮৪৫ সাল হইতে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের প্ররোচনায় তিনি "সর্ব্বার্থ সংগ্রহ" নামে জ্ঞান-গর্ভ মহা-কোষ স্বরূপ গ্রন্থ সকল প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া, ১৮৪৬ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ তাঁহাকে একখানি এলফিনষ্টোন প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস উপহার দিয়াছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা বীটন বা বেথুনের মৃত্যু হইলে তাঁহার নামে যে সভা স্থাপিত হয়, কৃষ্ণমোহন তাহার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৮৫২ সালে তিনি বিশপ কালেজের অধ্যাপকের পদে মনোনীত হইয়া শিবপুরে গিয়া বাস করেন। ১৮৬১-৬২ সালে হিন্দু ষড়দর্শন বিষয়ে প্রভূত গবেষণাপূর্ণ এক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৮৬৮ সালে শিবপুরে তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখের সঙ্গিনী বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মৃত্যু হয়। ঐ ১৮৬৭-৬৮ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ সালে Aryan Witness "আর্য্য শাস্ত্রের সাক্ষ্য" নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮৭৬ সালে লর্ড নর্থব্রুকের পরামর্শে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি ভারতসভার সভাপতিরূপে মনোনীত হন। ১৮৮০ সালে কলিকাতার অধিবাসিগণ তাঁহাকে মিউনিসিপালিটীতে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে বরণ করেন। মিউনিসিপালিটীতে সকলে তাঁহাকে নির্ভীক সত্যনিষ্ঠ ও অধর্ম্ম-বিদ্বেষী লোক বলিয়া জানিত। তিনি স্বকর্ত্তব্য-সাধনে কখনই অপরের মুখাপেক্ষা করিতেন না। এইরূপে চিরদিন তিনি স্বদেশে বিদেশের লোকের আদর সম্ভ্রম পাইয়া সকলের সম্মানিত হইয়া কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে কৃষ্ণমোহন স্বর্গারোহণ করেন।

রামগোপাল ঘোষ।

ডিরোজিওর শিষ্যদলের অগ্রণীদিগের মধ্যে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই রামগোপাল ঘোষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতী ও যশস্বী হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বর্ত্তমান বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট নামক গলিতে, স্বীয় পিতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের ভবনে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ। পৈতৃক নিবাস বাগাটী গ্রামে। ঐ গ্রাম হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী তীর্থের সন্নিকটে অবস্থিত। তাঁহার পিতামহ কলিকাতার কিং হামিল্টন কোম্পানির (King Hamilton & Co,) আফিসে কর্ম্ম করিতেন। কলিকাতার চীনাবাজারে তাঁহার পিতার একখানি দোকান ছিল। সেখানে তিনি সামান্য ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন।

রামগোপালের শৈশবকালের শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কিছু জানি না। সে সম্বন্ধে দুই প্রকার জনশ্রুতি আছে। এক জনশ্রুতিতে বলে, তিনি প্রথমে শারবরণ (Sherburne) সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে একটী ঘটনা ঘটে, যাহাতে তিনি হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইতে পান। সে ঘটনাটী এই, তাঁহার কোনও স্বসম্পর্কীয়া বালিকার সহিত হিন্দুকালেজের অন্যতম ছাত্র, ও পরবর্ত্তী সময়ের ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্যতম সভ্য হরচন্দ্র ঘোষের বিবাহ হয়। বালক হরচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক রামগোপালের মেধার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হন; এবং তাঁহাকে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য উৎসাহিত করেন। রামগোপাল তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া স্বীয় পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। তাঁহার পিতার এরূপ অর্থ সামর্থ্য ছিল না যে তিনি হিন্দুকালেজের বেতন দিয়া পুত্রকে পড়াইতে পারেন। এই সময়ে মিষ্টর রজার্স (Mr. Rogers) নামক কিং হামিল্টন কোম্পানির আপীসের একজন কর্ম্মচারী শিশু রামগোপালের বেতন দিতে স্বীকৃত হন। তাহাই ভরসা করিয়া তাঁহাকে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। অপর জনশ্রুতি এই যে রজার্স সাহেবের সাহায্যে তিনি প্রথম হইতেই হিন্দুকালেজে পড়িতে আরম্ভ করেন।

যাহা হউক তাঁহাকে অধিক দিন বেতন দিয়া পড়িতে হয় নাই। তাঁহার পাঠে মনোযোগ, ও অসাধারণ মেধা দেখিয়া মহামতি হেয়ার তাঁহাকে ত্বরায় অবৈতনিক ছাত্রদলে প্রবিষ্ট করিয়া লইলেন। ক্রমে ক্রমে রামগোপাল ডিরোজিওর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এখানে আসিয়া রামতনু লাহিড়ীর সহিত তাঁহার সম্মিলন ও আত্মীয়তা হইল। যে কতিপয় বালক ডিরোজিওর দিকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, রামগোপাল তাহাদের মধ্যে একজন। রামগোপালের আশ্চর্য্য ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া ডিরোজিও

তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; এবং ছুটীর পর তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া তৎকালপ্রসিদ্ধ ইংরাজী দর্শনকার ও সুকবিদিগের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন। একদিন সুবিখ্যাত দর্শনকার লকের (Locke) গ্রন্থাবলী পড়িবার সময় রামগোপাল বলিয়া উঠিলেন, "লকের মস্তক প্রবীণের ন্যায় কিন্তু রসনা শিশুর ন্যায়।" অর্থাৎ লক্ অতি প্রাঞ্জল ভাষাতে গভীর মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই উক্তিতে ডিরোজিও অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পরে রামগোপাল অনুগত শিষ্যের ন্যায় ডিরোজিওর অনুবর্ত্তন করিতেন। একাডেমিক এসোসিএশন যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি তাহার সভ্যগণের মধ্যে একজন অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। এই খানেই তাঁহার বক্তৃতাশক্তির প্রথম বিকাশ হইল। তিনি সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ইংরাজীতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিলেন। এখন হইতেই তাঁহার যশ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি সার্ এডোয়ার্ড রায়ান, (Sir Edward Ryan) মিষ্টর ডবলিউ, ডবলিউ বার্ড (Mr. W. W. Bird) প্রভৃতি তৎকালপ্রসিদ্ধ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ একাডেমিকের অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। সার এডওয়ার্ড রায়ান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ছিলেন, এবং বার্ড মহোদয় পরে বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। এই সভাতে রামগোপালের বাগ্মিতা ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইহাঁরা চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এবং তদবধি সর্ব্ববিষয়ে রামগোপালের উৎসাহদাতা দিলেন।

রামগোপাল কালেজের সমগ্র পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিলেন না। সেই সময়ে মিষ্টার জোসেফ নামে একজন ধনবান য়িহুদী বাণিজ্য করিবার আশয়ে কলিকাতাতে আগমন করেন। তাঁহার একজন ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ দেশীয় সহকারীর প্রয়োজন হয়। তিনি কলবিন কোম্পানির আফিসের মিষ্টার এণ্ডারসনের (Anderson) নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করেন। এণ্ডারসন মহামতি হেয়ারের নিকট লোক চাহিয়া পত্র লেখেন। হেয়ার রামগোপালকে উত্তমরূপে চিনিতেন। যে কার্য্যের জন্য লোকের প্রয়োজন রামগোপাল যে সে কার্য্যে সুদক্ষ হইবেন, ইহা তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল, সুতরাং তিনি রামগোপালকে মনোনীত করিলেন। ১৮৩২ সালে কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রামগোপাল মিষ্টর জোসেফের সহকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনুমানে বোধ হয় তাঁহার এত শীঘ্র কালেজ পরিত্যাগ

করিবার ইচ্ছা ছিল না; কারণ তিনি বিষয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও প্রকারে সময় করিয়া কিছুকাল কালেজে আসিতেন এবং কোন কোনও বিষয় ছাত্রদিগের সহিত সমভাবে শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন।

রামগোপাল অপেক্ষাকৃত স্বল্পবেতনে মিষ্টর জোসেফের আফিসে কর্ম্ম লইয়াছিলেন। কিন্তু ত্বরায় তাঁহার পদবৃদ্ধি হইল। কিছুদিন পরে মিষ্টর কেলসল (Kelsall) নামে অপর এক ধনী আসিয়া জোসেফের সহিত যোগ দিলেন; এবং রামগোপাল তাঁহাদের সম্মিলিত কারবারের মুচ্ছুদ্দি হইলেন; তাঁহার ধন দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে জোসেফ ও কেলসল এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল; তখন রামগোপাল (Kelsall, Ghose & Co. নামে) স্বাধীন বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভাবে কয়েক বৎসর গেল; তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কেলসলের সঙ্গেও তাঁহার বিবাদ ঘটিল। এই বিবাদের সমগ্র কারণ কেহই অবগত নহে। এইমাত্র জানা আছে যে, তিনি মিষ্টর কেলসলের সহিত বিবাদ করিয়া, ইংরাজসমাজের রীতি অনুসারে তাঁহার প্রদত্ত সমুদয় উপহার সামগ্রী ফিরিয়া দিয়া, নিজে ঘোষ কোম্পানি (R. G. Ghose & Co.) নাম লইয়া স্বতন্ত্রভাবে সওদাগরী কাজ চালাইতে লাগিলেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালে ঘটিয়াছিল। এ কার্য্যেও তাঁহার প্রভূত অর্থাগম হইয়াছিল।

একদিকে যখন তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল, অপর দিকে তিনি আত্মোন্নতি ও যথাসাধ্য স্বদেশের কল্যাণ সাধন বিষয়ে উদাসীন রহিলেন না। তাঁহার একটা বড় গুণ এই ছিল যে, তিনি বন্ধুগণের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। একদিন বন্ধুরা বাটীতে না আসিলে অস্থির হইয়া উঠিতেন; তাহাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইতেন। যতক্ষণ অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার সাধ্য থাকিত করিতেন, না পারিলে অপর কোনও প্রকারে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে একবার তাঁহার প্রিয়বন্ধু রামতনু লাহিড়ীর বড় অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইয়াছিল। তখন নিজের আয় সামান্য, অধিক অর্থ সাহায্য করিতে না পারিয়া তিনি মিষ্টর জোসেফকে বলিয়া রামতনু বাবুকে তাঁহার পারসীশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এতদ্ভিন্ন যখন যে বাল্যবন্ধুর বিপদ ঘটিয়াছে, রামগোপাল বুক দিয়া পড়িয়াছেন। উত্তরকালে তাঁহার বাল্যবন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক শেষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া কলিকাতা আসিলে, রামগোপাল স্বীয় গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটীতে তাঁহাকে

রাখিয়া, তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেমন সহৃদয়তা তেমনি সত্যপরায়ণতা। ঠিক সময়টা জানিতে পারি নাই, শুনিয়াছি তাঁহার পিতামহের যখন মৃত্যু হইল, তখন তাঁহার স্বসমাজস্থ লোকেরা তাঁহাকে হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ও স্বজাতিচ্যুত বলিয়া গোলযোগ করিবার উপক্রম করিলেন। ইহাতে তাঁহার পিতা ভীত হইয়া, তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণলোচনে একবার এই কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন যে তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজবিরুদ্ধ আচরণ কিছু করেন না। রামগোপাল পিতার কাকুতি মিনতিতে ক্লিষ্ট হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"আপনার অনুরোধে আমি সর্ব্ববিধ কার্য্য করিতে এবং সকল ক্লেশ সহিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পারিব না।" তাঁহার এই সত্যপরায়ণতার কথা দেশে রাষ্ট্র হইয়া গেল; তিনি স্বদেশবাসিগণের চক্ষে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে আর একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। একবার তাঁহার বাণিজ্য কার্য্যের মধ্যে সংকট-কাল উপস্থিত হয়। তখন এরূপ সম্ভাবনা হইয়াছিল, যে তিনি হয়ত নিজের কারবারের দেনা শুধিতে গিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া যাইবেন। সে সময়ে তাঁহার বন্ধুদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহাকে স্বীয় বিষয় বিনামী করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘৃণার সহিত বলিলেন,—"আমার সর্ব্বস্ব যায় সেও ভাল, আমি উত্তমর্ণদিগকে প্রতারণা করিতে পারিব না।"

তাঁহার সহৃদয়তা ও সত্যপরায়ণতার ন্যায় আত্মোন্নতির বাসনা ও পরোপ-কার প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। তাঁহার ১৮৩৮ সালের লিখিত দৈনিক লিপি আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহাতে দেখিতেছি এমন দিন যায় নাই, যে দিন তিনি কিছু না কিছু না পড়িতেছেন, বা জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত না আছেন। যে দিন কিছু ভাল বিষয় পড়িতেছেন না সে দিন দুঃখ করিতেছেন। তিনি বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও প্রতিদিন তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে দুই চারি জন তাঁহার ভবনে আসিতেন, তাহাদের সঙ্গে সদালাপে ও সৎগ্রন্থ পাঠে সুখে কাল কাটিত।

এই সময়ে তাঁহারা কতিপয় বন্ধু মিলিয়া আত্মোন্নতির জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। একাডেমিক এসোসিয়েসন ত ছিলই। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাহা হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। কিন্তু তাহার পূর্ব্ব প্রভাব আর রহিল না। তথাপি রাম-গোপাল প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ তাহাকে ১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিত

রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা কালগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ডিরোজিওর শিষ্যদল সমবেত হইয়া "লিপি-লিখন সভা" (Epistolary Association) নামে এক সভা স্থাপন করেন। তাহার সভ্যগণ পরস্পরের সহিত চিঠীপত্রে নানা বিষয়ের আলাপ করিতেন। এ সভা কিছুদিন চলিল। তৎপরে তাঁহারা অনুমান ১৮৩৮ সালে "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জন সভা" (Society for the Acquisition of General Knowledge) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রামগোপাল এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। এই সভার সভ্যগণ পূর্ব্বপ্রচারিত "জ্ঞানান্বেষণ" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। রামগোপাল তাহার লেখকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে সুবক্তারূপেই রামগোপালের প্রধান খ্যাতি আছে। নিম্নলিখিত ঘটনাসংযোগে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময় জর্জ টমসন্ (George Thomson) নামক একজন সুবিখ্যাত বক্তাকে সঙ্গে করিয়া আসেন। এই জর্জ টমসন সে সময়কার একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

টমসন্ ১৮০৪ সালে ইংলণ্ডের লিবারপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বৎসর বয়সের সময়ে ইহার পিতামাতা ইহাঁকে লণ্ডন নগরে আনেন। পিতামাতার অবস্থা মন্দ বলিয়া টমসন বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই বলিলে হয়। যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন ঘরে বসিয়া। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই দাসত্ব প্রথার দিকে ইহাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইনি তাহার বিরুদ্ধে বক্তৃতাদি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০ সালে বিবাহিত হইয়া ১৮৩৪ সালে দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য আমেরিকা গমন করেন। ১৮৩৬ সালে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া ভারতহিতৈষী কতিপয় সাধুপুরুষের সহিত সম্মিলিত হন। তৎপরে ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এদেশে আগমন করেন। জর্জ টমসন এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও রাজনীতির চর্চ্চা বিষয়ে এদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিবার মানসে এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহার ন্যায় বক্তা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার বক্তৃতা যাঁহার

শুনিয়াছিলেন তাঁহারা বলেন যে, তাঁহার এক এক বক্তৃতাতে তৎকালীন সমাজ অগ্নিময় হইয়া যাইত। তাঁহার উৎসাহে ও সাহায্যে কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশনের পূর্ব্বপুরুষ মনে করা যাইতে পারে। জর্জ টমসন্ এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র ডিরোজিওর শিষ্যদল তাঁহার চারিদিকে আবেষ্টন করিলেন। রামগোপাল তাঁহাদের অগ্রগণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদারী বালাখানা হইতে জর্জ টমসনের ও রামগোপাল ঘোষের রব বজ্রনির্ঘোষে উত্থিত হইতে লাগিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তদানীন্তন শ্রীরামপুরস্থ পত্রিকা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া (Friend of India) একবার লিখিলেন—"এখন দুই দিকে বজ্রধ্বনি হইতেছে, পশ্চিমে বালা হিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে।"

এই সময় হইতে রামগোপাল রাজনীতি সম্বন্ধীয় সমুদয় প্রশ্নের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাজনীতি বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে রঙ্গমঞ্চে আরোহণ করিয়া অগ্নিময় ভাষা উদ্গীরণ করিতেন। গবর্ণর জেনেরাল লর্ড হার্ডিঞ্জের স্মৃতি স্থাপনের জন্য কলিকাতার টাউনহলে ১৮৪৭ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর এক সভা হয়। তাহাতে টর্টন্, (Turton) হিউম, (Hume) কলভিল (Colville) প্রভৃতি কতিপয় সুবাগ্মী প্রসিদ্ধ ইংরাজ বারিষ্টার প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রভৃতি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হন। হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এদেশে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন এজন্য এদেশীয়গণ তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামগোপাল ঐ সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে উক্ত ইংরাজগণের প্রতিকূলতাবশতঃ প্রস্তাবটী নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন তাঁহারা এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রথমে ইংরাজগণ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন রামগোপালের প্রজ্বলিত অগ্নিসম তেজময় ও ওজস্বিনী ভাষা জাগিয়া উঠিল, তখন সকলকেই মৌনাবলম্বন করিয়া শুনিতে হইল। দেখিতে দেখিতে রামগোপালের অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তি সমগ্র সভাকে অভিভূত করিল; এবং অবশেষে অধিকাংশের মতে তাঁহারই প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহার ফল স্বরূপ হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের অশ্বারোহী মূর্ত্তি এখন গবর্ণমেণ্ট হাউসের সম্মুখস্থ ময়দানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বক্তৃতা এরূপ ওজস্বিনী হইয়াছিল যে পরদিন ইংরাজদিগের মুখপাত্র স্বরূপ প্রধান

সংবাদপত্রে লিখিল—"ভারতবর্ষে একজন ডিমস্থিনিস্ দেখা দিয়াছে, একজন বাঙ্গালি যুবক তিনজন সুদক্ষ ইংরাজ বারিষ্টারকে ধরাশায়ী করিয়াছে।"

১৮৫১ সালে যখন বর্ত্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিএশন স্থাপিত হয় তখন তিনি ইহার কমিটীভুক্ত হন। ১৮৫৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পুনর্গ্রহণের সময় এক মহাসভা হয়, তাহাতে রামগোপাল এক বক্তৃতা করেন। ইহাতে যেমন ওজস্বিতা, তেমনি সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর হেলিডে (Sir Frederick Halliday) মহোদয় এদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে তৎপূর্ব্বে পার্লমেণ্টের নিযুক্ত কমিটীর নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। রামগোপাল এই বক্তৃতাতে সেই সাক্ষ্যকে সুতীক্ষ্ণ বিচারছুরিকার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। তাহাতে তাঁহার প্রতিভার খ্যাতি বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। তৎপরে ১৮৫৮ সালে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করিলে আনন্দসূচক এক সভা হইয়াছিল, তাহাতে রামগোপাল বাগ্মিতার দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে হিন্দুপেট্রিয়টের হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ সভাতে, লর্ড ক্যানিংএর সম্বর্দ্ধনার্থ সভাতে, তিনি যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাও স্মরণযোগ্য। কিন্তু তাঁহার যে বক্তৃতা কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের স্মৃতিতে চিরদিন জাগরূক থাকিবে, যে জন্য তাঁহারা চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবেন, তাহা নিমতলার শ্মশান-ঘাট সম্বন্ধীয় বক্তৃতা। ১৮৬৪ সালে কলিকাতার মিউনিসিপালিটী নিমতলার বর্ত্তমান শ্মশানঘাটকে গঙ্গাতীর হইতে স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন। এই সময়ে রামগোপাল সমগ্র কলিকাতাবাসী হিন্দুগণের পক্ষ হইয়া উত্থিত হইয়াছিলেন; এবং প্রধানতঃ তাঁহারই অগ্নিময় বক্তৃতার গুণে ঐ প্রস্তাব স্থগিত হয়।

রামগোপাল যে কেবল বক্তৃতার দ্বারাই রাজনীতির আন্দোলনে সহায়তা করিতেন তাহা নহে। সময়ে সময়ে লেখনী ধারণও করিতেন। ১৮৪৯-৫০ সালে গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। ভারতবাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধস্থলে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতের ও দণ্ডবিধির অধীন করাই ঐ সকল পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য ছিল। এদেশীয়দিগকে ইংরাজদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ঐ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ ঐ সকল পাণ্ডুলিপির "কালা আইন" (Black Acts) নাম দিয়া তদ্বিরুদ্ধে ঘোর

আন্দোলন করেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ইলবার্ট বিলের যে আন্দোলন উঠিয়াছিল, ইহা যেন কতকটা তাহার অনুরূপ। ইংরাজগণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি গালাগালি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তখন দেশের এমনি অবস্থা যে, সেই উৎকৃষ্ট আইনগুলির সপক্ষে বলিবার জন্য কেহই ছিল না। তখন কেবলমাত্র রামগোপাল ঘোষ লেখনী ধারণ করিলেন; এবং "A few Remarks on certain Draft Acts, commonly called Black Acts" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ তাঁহার প্রতি এমনি চটিয়া গেলেন যে, তাঁহারা সমবেত হইয়া তাঁহাকে Agri-Horticultural Societyর সহকারী সভাপতির পদ হইতে অধঃকৃত করিলেন। এই সভা ১৮২১ সালে শ্রীরামপুরের সুবিখ্যাত উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে স্থাপিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহাকে উক্ত পদ হইতে অবিচার পূর্ব্বক সরাইয়া দেওয়াতে বিরক্ত হইয়া মিষ্টর সিসিল বীডন উক্ত সভার সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন। ইনিই পরে সার সিসিল বীডনরূপে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

কেবল রাজনীতি বিষয়ে নহে, দেশের সর্ব্ববিধ সদনুষ্ঠানে রামগোপাল উৎসাহ-দাতা ছিলেন। মহামতি হেয়ারের যে সুন্দর শ্বেত-প্রস্তরময় মূর্ত্তিটী এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছে, তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টাতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৪১ সালে, ১৭ই জুন কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের আহ্বানে মেডিকেল কালেজে এক সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাত্মা হেয়ারের একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। সেই সভাতেই অনেকে এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু রামগোপাল উদ্যোগী হইয়া নিজের এক মাসের আয় দিয়া, হেয়ারের শিষ্যবর্গকে এক এক মাসের আয় এই জন্য ব্যয় করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রার্থনাপত্র প্রকাশ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহার দৃষ্টান্ত ও আগ্রহে হেয়ারের শিষ্যগণের অনেকেই এক এক মাসের আয় দিয়াছিলেন। এইরূপে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা হেয়ারের প্রস্তর-মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মূর্ত্তি প্রথমে সংস্কৃত কালেজের প্রাঙ্গণে স্থাপিত হয়। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কালেজ গৃহ নির্ম্মিত হইলে, তাহার প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে।

বৃদ্ধাবস্থাতে রামগোপাল বিষয়কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া একান্তে বাস করিতেন। তখন আত্মীয় স্বজনকে ও স্বীয় বন্ধুবান্ধবকে বিবিধপ্রকারে সহা-

রতা করা তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল। তখনও স্বদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। যৌবনকালে তিনি যে স্বাধীন-চিন্ততার ও সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, উত্তরকালে কিয়ৎপরিমাণে তাহার বিপর্য্যয় ঘটিলেও তাহা তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। ১৮৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি একটি মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণের নিকটে ঋণ স্বরূপ তাঁহার প্রায় ৪০,০০০ হাজার টাকা পাওনা ছিল; তিনি সেই সকল ঋণের সমুদয় কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলিয়া, আপনার বন্ধুদিগকে অঋণী করিয়া গেলেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক।

দুঃখের বিষয় ইঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিক কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও রামগোপাল ঘোষের পর ইনিই ডিরোজিও-দলের অগ্রণীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বরং এরূপ শুনিয়াছি যে একাডেমিকের বক্তৃতাদি যাঁহারা শুনিতে আসিতেন, তাঁহারা রামগোপালের উন্মাদিনী বক্তৃতা অপেক্ষা রসিকের গভীর চিন্তা ও বিজ্ঞতাপূর্ণ বক্তৃতা ভাল বাসিতেন। রামতনু বাবুর মুখে সর্ব্বদা তাঁহার নাম শুনিতাম। তাঁহার সারাজীবনে যেন একদিনের জন্যও রসিক তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে রসিক যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা গুরুবাক্যের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। আমাদের ন্যায় নবাদলের কোনও মত যদি রসিকের মতের বিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে লাহিড়ী মহাশয় তাহা কাণে তুলিতেন না; বলিতেন "তোমরা কি রসিকের চেয়ে ভাল বোঝ?" এই বাল্য-সুহৃদ অথচ গুরুতুল্য রসিককৃষ্ণ মল্লিকের জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিক কথা যে পাঠকগণকে শুনাইতে পারিলাম না, এজন্য দুঃখিত রহিলাম। তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে দিতেছি।

অনুমান ১৮১০ সালে কলিকাতার সিন্দুরীয়া পটী নামক স্থানে রসিককৃষ্ণের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নবকিশোর মল্লিক। নবকিশোর মল্লিকের

সহরে সুতার কারবার ছিল। প্রাচীন কলিকাতার সুবিখ্যাত শেঠবংশীয়গণ এই তিলি জাতীয় বণিকদল ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং একথা বোধ হয় বলিতে পারা যায় যে, ইঁহারা কলিকাতার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন।

সেকালের রীতি অনুসারে রসিককৃষ্ণ কিছুদিন গুরুমহাশয়ের পাঠশালে পড়িয়া ও সামান্যরূপ ইংরাজী শিখিয়া হিন্দুকালেজে প্রেরিত হন। অল্পকাল মধ্যেই সেখানে বিদ্যা বুদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮২৮ সালে ডিরোজিও যখন হিন্দুকালেজে আসিলেন, রসিককৃষ্ণ বোধ হয় তখন হিন্দুকলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন। তিনিও আকৃষ্ট হইয়া ডিরোজিও দলে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং অপর সকলের ন্যায় আত্মীয় স্বজনের হস্তে নিগ্রহ সহ্য করিতে লাগিলেন।

এরূপ জনশ্রুতি, কালেজে পাঠকালে নিম্নলিখিত ঘটনাটী ঘটে। তৎকালে কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে হিন্দু সাক্ষীদিগকে তামা, তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য দিতে হইত। তামা তুলসী গঙ্গাজল আনিবার জন্য একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত ছিল। আমরা প্রথমে কলিকাতাতে আসিয়া তাহাকে যখন দেখিয়াছি, তখন তাহার বৃদ্ধাবস্থা। ঐ উড়িয়া ব্রাহ্মণ একখানি তাম্রকুণ্ডে করিয়া তুলসী ও গঙ্গাজল লইয়া সাক্ষীদের সম্মুখে আনিয়া ধরিত, তাহা স্পর্শ করিয়া হিন্দু সাক্ষীদিগকে শপথ করিতে হইত। যখন এই নিয়ম ছিল, তখন একবার কোনও মোকদ্দমাতে সাক্ষী হইয়া বালক রসিককৃষ্ণকে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইতে হয়। তিনি সাক্ষ্য দিতে দাঁড়াইলে উড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রথামত তাম্রকুণ্ড লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মধ্যে এক বিষম সংকট উপস্থিত। রসিককৃষ্ণ তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে চাহিলেন না; স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। আদালত শুদ্ধ লোক বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেল। বিচারপতি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রসিক বলিলেন—"আমি গঙ্গা মানি না।" যখন ইণ্টারপ্রিটার উচ্চৈঃস্বরে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া জজকে শুনাইলেন—"I do not believe in the sacredness of the Ganges" তখন একেবারে চারিদিকে ইস্ ইস্ শব্দ উঠিয়া গেল; হিন্দু শ্রোতৃগণ কাণে হাত দিলেন। অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে এই সংবাদ সহরে ছড়াইয়া পড়িল। "মল্লিকদের বাটীর ছেলে প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়া বলিয়াছে গঙ্গা মানি না; ঘোর কলি উপস্থিত, দেখ কালেজের শিক্ষার কি ফল!" সম্প্রতি কুমারী কলেটের লিখিত যে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত

বাহির হইয়াছে, তাহাতে রামমোহন রায়ের একজন শিষ্যের বিষয়ে এইরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ আছে। বালক রসিককৃষ্ণই বোধ হয় সেই শিষ্য। রসিককৃষ্ণের বিষয়ে এইরূপ গল্প, লাহিড়ী মহাশয়ের ও ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়াছে। রসিককৃষ্ণের যে রামমোহন রায়ের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ছিল তাহার প্রমাণও আছে। রাজার মৃত্যুর পর ১৮৩৪ সালে তাঁহার স্মরণার্থ কলিকাতাতে এক সভা হয়। তাহাতে বাঙ্গালী বক্তার মধ্যে তিনিই ছিলেন।

ডিরোজিও কালেজ ত্যাগ করার পরও তাঁহার শিষ্যদল সংস্কার কার্য্যে কিরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রসিকও যে সে বিষয়ে তাঁহার বন্ধুদের সঙ্গী হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে বাড়ীর লোক ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রসিককৃষ্ণের জননী কোনও প্রকারে তাঁহার মতিগতি ফিরাইতে না পারিয়া, পাড়ার নির্ব্বোধ বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগের প্ররোচনায়, তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য, তাঁহাকে পাগলাগুঁড়ো খাওয়াইলেন। হেয়ারের জীবনচরিতে প্যারীচাঁদ মিত্র লিখিয়াছেন, এবং রসিককৃষ্ণের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মুখেও শুনিয়াছি যে, এই ঔষধ খাইয়া তিনি সমস্ত রাত্রি অচেতন হইয়া ছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে কাশীতে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। নৌকা প্রস্তুত, তাঁহার হাত পা দড়িতে বাঁধা। তিনি চেতনালাভ করিয়া কোনও প্রকারে আপনাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিলেন। পলায়ন করিয়া চোরবাগানে এক বাসা করিলেন। সেই বাসা ডিরোজিও দলের এক আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল। লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি তিনি সর্ব্বদা সেখানে যাইতেন। সেই বাটীতে হিন্দুসমাজের কেল্লা ভগ্ন করিবার সকল প্রকার পরামর্শ স্থির হইত। ইহারই পরে বোধ হয়, দক্ষিণারঞ্জনের অর্থে ও উৎসাহে "জ্ঞানান্বেষণ" নামক দ্বিভাষী পত্রিকা বাহির হয়, এবং রসিকের প্রতি তাহার সম্পাদকতার ভার অর্পিত হয়।

রসিককৃষ্ণ কালেজ হইতে বাহির হইয়া কিছুদিন হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু ঠিক কতদিন ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক ত্বরায় তাঁহার পদবৃদ্ধি হয়। ১৮৩৪ সালের পর যখন হিন্দু কালেজের কৃতবিদ্য যুবকগণকে ডেপুটী কালেক্টরী পদ দেওয়া হইতে লাগিল, তখন তিনিও ডেপুটী কালেক্টরী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি অনেক দিন বর্দ্ধমানে বাস করেন। এই

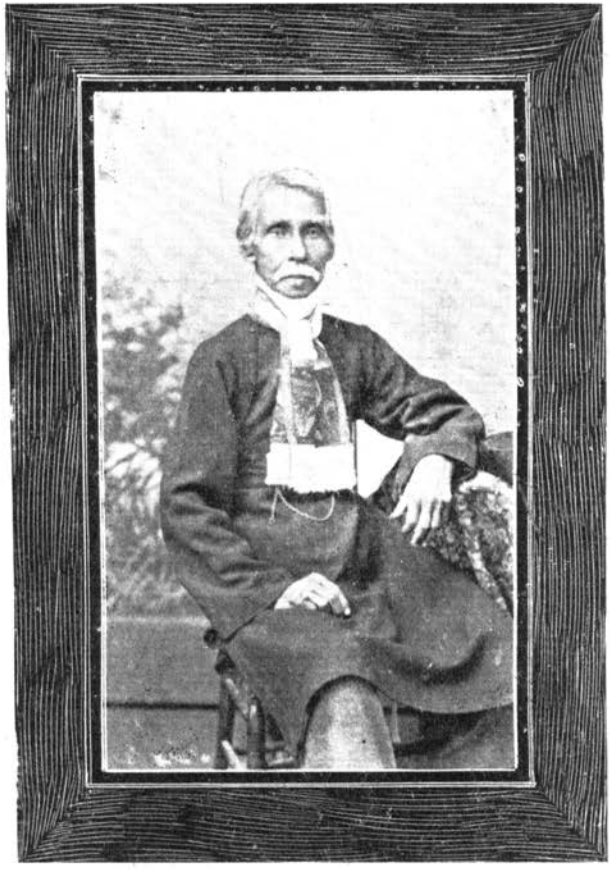

শিব চন্দ্র দেব।

(১৩১ পৃষ্ঠা)

কালের মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মভীরুতার বিশেষ সুখ্যাতি প্রচার হয়। এরূপ শুনিয়াছি বর্দ্ধমানের রাজসংসারের লোক অনেকবার তাঁহাকে উৎকোচাদি দ্বারা বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তাঁহাকে স্বকর্ত্তব্য-সাধনে বিমুখ করিতে পারেন নাই। রসিককৃষ্ণ ঘৃণাপূর্ব্বক সেই সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেন; এবং ন্যায়বিচার হইতে রেখামাত্র বিচলিত হইতেন না।

বর্দ্ধমানে বাসকালের আর একটী স্মরণীয় ঘটনা এই যে, সেই কালের মধ্যে কিছুদিন লাহিড়ী মহাশয় বর্দ্ধমান স্কুলের শিক্ষকরূপে সেখানে বাস করিয়াছিলেন। তখন প্রায় প্রতিদিন দুই বন্ধুতে একত্র বাস করিতেন। লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় বন্ধুর পরামর্শ না লইয়া কোনও কাজ করিতেন না। তখন হইতেই রসিককৃষ্ণ তাঁহার guide, philosopher and friend এর পদ অধিকার করিয়াছিলেন। রসিককৃষ্ণের ছবি সেই যে তাঁহার মনে মুদ্রিত হইয়া গেল, সারা জীবনে আর তাহা একদিনের জন্যও হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই।

অনুমান ১৮৫৮ সালে রসিককৃষ্ণ পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়বন্ধু রামগোপাল ঘোষ তাঁহাকে কামারহাটীস্থ স্বীয় বাগান-বাটীতে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষাতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুঃখের বিষয় সে রোগ হইতে রসিককৃষ্ণ আর আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুকালে বন্ধুদ্বয় রামগোপাল ঘোষ ও প্যারীচাঁদ মিত্রকে স্বীয় বিষয় বিভবের একৃজিউটার ও পরিবারগণের রক্ষক ও অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তাঁহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা সমুচিতরূপেই চিরদিন ঐ ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন; এবং সকল প্রকার আপদ বিপদে চিরদিন তাঁহাদের সহায়তা করিয়াছেন।

শিবচন্দ্র দেব।

এই সাধুপুরুষ কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থিত কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুকাল সেই গ্রামকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট আফিস, ইংরাজী স্কুল, বাঙ্গালা স্কুল, ডিস্‌পেন্সরী, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি কোন্নগরের উন্নতির যে কিছু চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সকলি ইঁহারই চেষ্টার ফল। ইঁহার কথা

কোন্নগরের লোক বহুদিন ভুলিতে পারিবে না। ইঁহার স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত হইতে ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত সংকলন করিতেছি।

১৮১১ সালে ২০শে জুলাই কোন্নগর গ্রামে শিবচন্দ্র দেবের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ব্রজকিশোর দেব, কমিসরিয়েটে সরকারের কাজ করিতেন। ঐ কাজে তখন বিলক্ষণ আয় ছিল। সুতরাং ব্রজকিশোর দেব সে সময়কার একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি বহুকাল সরকারী কাজ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পেন্‌শন্ লইয়া কার্য্য হইতে অবসৃত হন। সংসারের শৃঙ্খলা, সুবন্দোবস্ত ও সকল কার্য্যের সুনিয়মের জন্য তিনি গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা একটী ঘড়ি নিকটে রাখিতেন, এবং তদনুসারে সকল কাজ যথা সময়ে করিতেন। তাঁহার সমুদয় কাজ কর্ম্ম ধার্ম্মিক হিন্দুগৃহস্থের আদর্শ-স্থানীয় ছিল।

শিবচন্দ্র ব্রজকিশোরের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। প্রথমে তদানীন্তন রীতি অনুসারে গ্রাম্য পাঠশালাতে শিবচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি গৃহে বসিয়াই একজন আত্মীয়ের সাহায্যে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। তৎপরে কিছুদিন গোলমালেই কাটিয়া যায়। সে সময়ের মধ্যে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে কেহই বিশেষ মনোযোগ করেন নাই। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিশেষ আগ্রহে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনেন; এবং ১৮২৫ সালের ১লা আগষ্ট দিবসে, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে, তাঁহাকে হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। হিন্দুকালেজে তিনি ছয় বৎসর পাঁচ মাস কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ১৬৲ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি ডিরোজিওর শিষ্যদলভুক্ত হইয়া তাঁহার যৌবনসুহৃদগণের সহিত সম্মিলিত হন। সে বন্ধুতার স্মৃতি চিরদিন তাঁহার হৃদয়ে লেখা ছিল। উত্তরকালে যখন তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ, তখনও তাঁহার নিকটে বসিলে সময়ে সময়ে দেখা যাইত যে, ডিরোজিওর সামান্য সামান্য উক্তিগুলি তাঁহার মনে উজ্জ্বল রহিয়াছে, যেন কল্যকার ঘটনা।

কালেজে পাঠের সময়ে পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতৃব্য হরিমোহন সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মে; এবং সে সময়ে উভয় বন্ধুতে মিলিয়া আরব্য উপন্যাস বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন।

কালেজ ছাড়িয়া তিনি কয়েক বৎসর প্রথমে জি, টি, সর্‌ভে আফিসে ৩০৲ টাকা বেতনে কম্পিউটারের কাজ করেন। তৎপরে ১৮৩৮ সালে ডেপুটী কালেক্টারের পদে উন্নীত হইয়া বালেশ্বর গমন করেন। ১৮৪৪ সালে বালেশ্বর হইতে মেদিনীপুরে বদলী হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিকটস্থ আলিপুরে চব্বিশ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন।

১৮৫৭ সালে যখন সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন শিবচন্দ্র বাবুকে অকারণ একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সে সময়ে একদিন তিনি রেলগাড়িতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। সেই গাড়িতে কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মিউটিনীর কথা উপস্থিত হয়। তখন শিবচন্দ্র বাবু স্বাধীনভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজ ভদ্রলোকগুলি কলিকাতাতে পৌঁছিয়াই এই কথোপকথনের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। এই সামান্য কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান।

ইহার পরে তিনি আরও অনেক পদে উন্নীত হইয়া দক্ষতার সহিত অনেক কার্য্য করিয়া ১৮৬৩ সালে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হন। অপরাপর লোকের পক্ষে বিষয় কর্ম্ম হইতে অবসৃত হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিশ্রামসুখ ভোগ করা; কিন্তু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পক্ষে তদ্বিপরীত ঘটিল। পেনশন্ লইয়া কোন্নগরে বাস করিয়াই তিনি স্বীয় বাসগ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

পূর্ব্ব হইতেই স্বদেশের উন্নতি-সাধনে তিনি মনোযোগী ছিলেন। মেদিনীপুরে বাস কালে সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতাতে বদলী হইয়াই স্বীয় বাসগ্রামের উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তৎপূর্ব্বে ১৮৫২ সালে গ্রামবাসিগণকে সমবেত করিয়া কোন্নগর হিতৈষিণী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করেন। ১৮৫৪ সালে তাঁহারই প্রযত্নে ও তাঁহার বন্ধুগণের সাহায্যে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে উক্তগ্রামে হাডিঞ্জ বাহাদুরের সময়ের স্থাপিত একটী মডেল বাঙ্গালা স্কুল মাত্র ছিল। ইংরাজীস্কুল স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৫৬ সালে গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুলটী তুলিয়া দেন। কিন্তু গ্রামমধ্যে একটী বাঙ্গালা স্কুল থাকা আবশ্যক বোধে ১৮৫৮ সালে প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে আবার একটী বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়।

স্কুল দুইটী স্থাপন করিয়া তিনি গ্রামবাসিগণের ব্যবহারার্থ একটী সাধারণ

পুস্তকালয়ের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তদনুসারে প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতে, ১৮৫৮ সালে একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইল।

এখানেই তাঁহার শ্রমের বিরাম হইল না। হিন্দুকালেজে পাঠকালে তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বড়ই অনুভব করিয়াছিলেন; এবং ১৮২৬ সালে হুগলী জেলার গোপালনগরের বৈদ্যনাথ ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় হইলে, তিনি স্বীয় বালিকা পত্নীকে বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখাইতে আরম্ভ করেন। প্রৌঢ়াবস্থাতেও তাঁহার সে উৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই। যখন যেখানে গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া আপনার কন্যাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তৎপরে মহাত্মা বেথুন কলিকাতাতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে, দলপতিদিগের মহা আন্দোলন সত্ত্বেও তিনি আপনার এক কন্যাকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এরূপ যাঁহার উৎসাহ, তিনি যে স্বীয় বাসগ্রামের বালিকাগণের শিক্ষার উপায় বিধান না করিয়া স্থির থাকিবেন ইহা সম্ভব নহে। ১৮৫৮ সালে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদি বালিকাস্কুলের গৃহনির্ম্মাণার্থ ৫০০ পাঁচ শত টাকা দেন, তাহা হইলে তিনি নিজে আর ৫০০ পাঁচ শত টাকা দিতে পারেন, এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৪৫ টাকা দিলে তিনি ১৫ টাকা চাঁদা তুলিতে পারেন। অনেক লেখালিখির পরে গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

শিবচন্দ্র বাবু তাহাতে নিরুদ্যম না হইয়া, স্বীয় চেষ্টায়, স্বীয় অর্থে স্বীয় ভবনে, ১৮৬০ সালে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিছু-দিন পরে তাঁহারই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে, তাঁহারই ব্যয়ে ঐ বিদ্যালয়ের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মিত হইল। তাহাতে বালিকা-বিদ্যালয় উঠিয়া গেল এবং এখনও সেইখানে আছে।

কেবল তাহা নহে, ১৮৬২ সালে তিনি শিক্ষিতা নারীদিগের ব্যবহারার্থ "শিশুপালন" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিলেন। পরে ১৮৬৭ সালে "অধ্যাত্মবিজ্ঞান" নামে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অগ্রে কোন্নগরে ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশন ছিল না। কোন্নগরবাসীদিগকে হয় বালী ষ্টেশনে, না হয় শ্রীরামপুর ষ্টেশনে গিয়া গাড়িতে উঠিতে হইত; তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা

দূর করিবার মানসে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকটে কোন্নগরে একটী ষ্টেশন করিবার জন্য আবেদন করেন। ঐ আবেদনের ফলস্বরূপে ১৮৫৬ সালে কোন্নগরে ষ্টেশন খোলা হয়।

তাঁহারই আবেদন অনুসারে ১৮৫৮ সালে কোন্নগরে একটী ডাকঘর স্থাপিত হয়।

কোন্নগরে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দিলে, তাঁহারই প্রযত্নে গবর্ণমেণ্ট একটী চ্যারিটেবল ডিস্‌পেনসারি স্থাপন করেন। তিনি সেজন্য একটী বাড়ী ডিস্‌পেন্সারির ব্যবহারার্থ বিনা ভাড়াতে দেন। ঐ ডিসপেন্সারির দ্বারা কোন্নগরের লোকের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, ১৮৮১ সালে গবর্ণমেণ্ট ঐ ঔষধালয়টী তুলিয়া দেন। ১৮৮৩ সালে শিবচন্দ্র বাবু নিজের ব্যয়ে একটী হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করেন। উহা হইতে প্রতিদিন প্রাতে দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইত। এই কার্য্যটী তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবন-চরিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, যৌবনকালে যখন তিনি ডিরোজিওর শিষ্যদল ভুক্ত ছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার প্রাচীনধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়; এবং তিনি অন্তরে অন্তরে একেশ্বর-বাদী হন। কিন্তু বহুবৎসর কর্ম্মসূত্রে নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময়ে সে অন্তরের বিশ্বাস অন্তরেই থাকে; তদনুসারে কার্য্য করিবার বিশেষ সুবিধা পান নাই। পরে ১৮৪৩ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ইহাকে বলশালী করিয়া তোলেন এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতার অধীনে যোগ্যতাসহকারে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদিত হইতে থাকে, তখন, ১৮৪৪ সালে, তিনি উক্ত পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি বালেশ্বর হইতে বদলী হইয়া মেদিনীপুরের ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি ১৮৪৬ সালে মেদিনীপুরে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন; এবং উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিহিত আলিপুরে যখন চব্বিশ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরেই বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম

গ্রহণ করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরূপে পরিগণিত হন। কেবল তাহা নহে, আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে ঐ ধর্ম্মের আশ্রয়ে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন; এবং ঈশ্বর প্রসাদে সে চেষ্টাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ সালে রাজকার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া যখন স্বীয় বাসগ্রামে বাস করিলেন, তখন সেখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমাজ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৬৬ সালে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, তিনি ঐ দলের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার নেতৃবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। বহুবৎসর ইহার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে পুত্রের বিবাহ দেওয়াতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও তাঁহার স্বগ্রামবাসী বন্ধুগণ তাঁহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি একদিনের জন্যও দুঃখিত ছিলেন না, বা একদিনের জন্য গ্রামবাসীদিগের হিতেচ্ছা তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সমভাবে সকলের কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতিতে সহায় হইবার চেষ্টা করিতেন।

জীবনের অবসানকালে তিনি কলিকাতাতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। এইখানেই ১৮৯০ সালের ১২ নবেম্বর বুধবার মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এরূপ সাধুপুরুষের অবসানকাল যেরূপ হয় শিবচন্দ্র দেবের অবসানকাল সেইরূপই হইয়াছিল। ভাঁটার জল যেমন অল্পে অল্পে নামিয়া যায়, তাঁহার জীবননদীর জল যেন তেমনি অল্পে অল্পে কমিয়া গেল। জীবনের সঙ্গিনী সহধর্ম্মিণীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, পুত্র কন্যা দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত দেশহিতকর নানা বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে শান্তিতে শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে সদাশয়তা, মিতাচারিতা পরহিতৈষণা, কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ধর্ম্মভীরুতার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। সত্য সত্যই ডিরোজিওবৃক্ষের এই ফলটী অতি মধুর হইয়াছিল।

হরচন্দ্র ঘোষ।

ইনি কলিকাতার ছোট আদালতের সুবিখ্যাত জজদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত; ইনিও ডিরোজিও বৃক্ষের একটী উৎকৃষ্ট ফল ও রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃদগণের মধ্যে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি। অনুমান ১৮০৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। শৈশব-কাল হইতেই ইঁহার জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মোন্নতির ইচ্ছা অতিশয় বলবতী দৃষ্ট হইয়াছিল। সেকালে বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থদিগের মধ্যে সন্তানদিগকে পারসী শিখাইবার রীতি ছিল। ইংরাজী শিক্ষার দিকে কেহ বিশেষ মনোযোগ করিতেন না। কিন্তু বালক হরচন্দ্র কেবল পারসী শিখিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া ইংরাজী শিখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এরূপ শোনা যায়, নিজের ব্যগ্রতা ও চেষ্টার গুণে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। হিন্দু-কালেজের যে সকল বালক ডিরোজিওর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলীভুক্ত হন, হরচন্দ্র ঘোষ তন্মধ্যে একজন প্রধান। চিরদিনই তাঁহার প্রকৃতিতে এক প্রকার ধীরচিত্ততা ও স্থিতিশীলতা ছিল। তিনি ডিরোজিওর শিক্ষার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অপরাপর বন্ধুদিগের ন্যায় ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই।

একাডেমিক এসোসিএশন স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন; এবং উক্ত সভাতে বক্তৃতাদি করিতেন। এরূপ শোনা যায়, তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় তাঁহাকে নিজের সঙ্গে পশ্চিমে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। হরচন্দ্র কেবল বীয় জননীর প্রতিকূলতা বশতঃ সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের সঙ্গে যাইতে না পারিলেও উক্ত মহামতি রাজপুরুষের চিত্ত হইতে অন্তর্হিত হন নাই। ১৮৩২ সালে যখন এ দেশীয় লোকের জন্য মুন্সেফী পদের সৃষ্টি হইল, তখন গবর্ণর জেনেরাল হরচন্দ্রকে বাঁকুড়ায় মুনসেফ নিযুক্ত করিলেন। তিনি বাঁকুড়াতে পদার্পণ করিবামাত্র লোকে বুঝিতে পারিল যে একজন উন্নতচেতা, সত্যপ্রিয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষ আসি-য়াছেন। হরচন্দ্র আদালতের চেহারা, হাওয়া ও কার্য্যপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিলেন। রীতিমত ১০টা ৫টা কাছারি আরম্ভ হইল; হরচন্দ্র স্বহস্তে পক্ষীর জবানবন্দী লিখিতে লাগিলেন; সর্ব্বসমক্ষে আপনার রায় লিখিতে ও ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের বিচারকার্য্যের প্রতি প্রগাঢ়

আস্থা জন্মিল। সে সময়ে লোকে উৎকোচগ্রহণকে পাপ বলিয়াই মনে করিত না। কিন্তু হরচন্দ্র ঘোষ এমনি ধর্ম্মপরায়ণতার সহিত বিচারকার্য্য করিতে লাগিলেন যে শুনিয়াছি তাঁহার এক শত টাকা বেতনে কুলাইত না বলিয়া কলিকাতা হইতে তাঁহার খরচের জন্য মধ্যে মধ্যে টাকা লইতে হইত।

বাঁকুড়া বাসকালে কেবল যে তিনি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন তাহা নহে। ডিরোজিও-মণ্ডলী হইতে তিনি এই দৃঢ়বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন যে শিক্ষা ভিন্ন এদেশের দুর্গতি দূর হইবার উপায়ান্তর নাই। তাই নিজ কার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াই সেই বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজ ব্যয়ে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া সেখানে বালকদিগকে শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। আবার নিজ জ্ঞানের উন্নতিসাধনেও মনোযোগী রহিলেন।

এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে কার্য্যদক্ষতার গুণে তিনি সদর আমীনের পদে উন্নীত হইলেন। বাঁকুড়াতে সুখ্যাতির সহিত ছয় বৎসর কার্য্য করিয়া হরচন্দ্র ১৮৩৮ সালে হুগলীতে বদলী হন। ১৮৪৪ সালে প্রিন্সিপাল সদর আমীন হইয়া ২৪ পরগণাতে আসেন। ১৮৫২ সালে তিনি কলিকাতা পুলিস-কোর্টে জুনিয়ার মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হয়। ১৮৫৪ সালে কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হন।

কিন্তু তিনি অপর লোকের ন্যায় কেবল আপনার পদবৃদ্ধি ও অর্থাগম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না। কলিকাতাতে অবস্থান কালে তিনি দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির সহায়তা করিতেন। মহাত্মা বেথুন যখন বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার কমিটীভুক্ত হইয়া বিশেষরূপে সহায়তা করেন। মহাত্মা ডেবিড হেয়ারের মৃত্যু হইলে যখন তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হয়, তখন তিনিই ঐ কমিটীর সম্পাদক হইয়া সে কার্য্য সমাধা করেন।

প্রতিভাশালী ও জ্ঞানানুরাগী ব্যক্তিদিগকে সহায়তা করিতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। হিন্দুপেট্রিয়টের সুবিখ্যাত সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালকে তিনি এক সময়ে পুত্র-নির্ব্বিশেষে সহায়তা করিয়াছিলেন। অপরাপর অনেক দরিদ্র সন্তানকে তিনি অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বারা পালন করিতেন।

১৮৬৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর হরচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার

১৮৬৮ সালে তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন। এই পদে দুই বৎসর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কায়মনে স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পরলোক হইলে তিনি অনেকটা সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া পড়েন; এবং প্রেততত্ত্বের আলোচনাতে মনোনিবেশ করেন। তাঁহার এই স্বভাব ছিল যে, যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন তাহার আধখানা জানিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। যখন প্রেততত্ত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা হইতে ভূরি ভূরি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার বাল্যসুহৃদ ও তাঁহার বৈবাহিক শিবচন্দ্র দেব মহাশয় তাঁহার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। দুই বৈবাহিকে মিলিয়া সর্ব্বদা এই বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তাঁহারা উভয়ে প্রেত-তত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাদাম ব্লাভাট্স্কি ও কর্ণেল অলকট্ যখন এদেশে আসিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের স্থাপিত থিওসোফিকাল সোসাইটীতে যোগ দিলেন, এবং উক্ত সভার বঙ্গদেশীয় শাখার প্রধান পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন। তখন সকল প্রকার আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনাতে তাঁহার বালকের ন্যায় উৎসাহ দেখিতাম। আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক বিষয়ের চর্চ্চাতে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার কাছে বসিলে অনেক জ্ঞানলাভ করা যাইত।

এইরূপে জ্ঞানালোচনা, সৎসঙ্গ, ও সৎপ্রসঙ্গে তাঁহার কাল এক প্রকার সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৩ সালে দারুণ উদরী রোগে আক্রান্ত হইলেন। ঐ রোগে কিছুদিন কষ্ট পাইয়া ঐ সালের ২৩শে নবেম্বর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুগণ সম্মিলিত হইয়া এক সভা করিয়া, তাঁহার দুই স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। মেটকাফ হলে তাঁহার এক ছবি আছে, এবং কলিকাতার টাউন হলে এক প্রস্তর-নির্ম্মিত উত্তমাঙ্গ আছে।

রাধানাথ শিকদার।

ইনিও ডিরোজিও বৃক্ষের একটী উৎকৃষ্ট ফল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে কলিকাতা যোড়াশাঁকোর অন্তঃপাতী শিকদার-পাড়া নামক স্থানে রাধানাথের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। ইনি ভিন্ন তিতুরামের আর এক পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। রাধানাথ সকলের বড়। এই শিকদারগণ ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত এবং কলিকাতার অতি প্রাচীন অধিবাসী। মুসলমান নবাবদিগের সময়ে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বংশ-পরম্পরা ক্রমে শিকদার বা পুলিস কমিশনরের কাজ করিতেন। ইহাদের অধীনে বহুসংখ্যক লাঠিয়াল, পাইক ও সৈনিক প্রভৃতি থাকিত। ইঁহারা দুর্বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিতে, কয়েদ করিতে ও সাজা দিতে পারিতেন। অনেক স্থলে এই শক্তির অপব্যবহার হইত, এবং যাহা লোকের রক্ষার উদ্দেশ্যে দেওয়া হইয়াছিল, তাহা লোকের পীড়নের জন্য ব্যবহৃত হইত। এমন কি এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, কলিকাতা ইংরাজদিগের অধিকৃত হওয়ার পরেও যখন ফৌজদারী কার্য্যের ভার মুরশিদাবাদের নবাবের হস্তে ছিল, তখনও ইঁহারা শিকদারের কাজ করিতেন। পরে কোনও এক বিশেষ স্থলে একজনের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন হওয়াতে সে দিকে ইংরাজদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; এবং সেই আন্দোলনে ইঁহাদের হস্ত হইতে শক্তি অপহৃত হয়।

রাধানাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার পিতা বা তাঁহার বংশের কেহ শিকদারের কাজ করিতেন না। তিতুরাম আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথকে কিছুদিন পাঠশালে ও ফিরিঙ্গী কমল বসুর স্কুলে পড়াইয়া হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮২৪ সালে তিনি হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন এবং সাত বৎসর দশমাস কাল তথায় অধ্যয়ন করেন। ইঁহার একটী উৎকৃষ্ট অভ্যাস ছিল; দৈনিক লিপি লিখিতেন। তাহা হইতে সে সময়কার অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীনাথ শিকদার রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহপাঠী ও তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার সহিত লাহিড়ী মহাশয় সর্ব্বদা ইঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন, তখন রাধানাথের জননী পুত্রনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে যত্ন করিতেন। সেই অকৃত্রিম স্নেহ ও সদাশয়তার স্মৃতি চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়ের মনে মুদ্রিত ছিল।

রাধানাথ যে শ্রেণীতেই উন্নীত হইতেন সেই শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য বালকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীতে আসিয়াই রাধানাথ তৎকালের রীতি অনুসারে ষোল টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সমুদয় শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণিতের প্রতি তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। সে সময়ে ডাক্তার টাইট্‌লার (Dr. Tytler) নামে হিন্দু কালেজে একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। এই ডাক্তার টাইট্‌লার সে সময়কার উৎকেন্দ্র ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডাক্তার টাইট্‌লারের সহিত বিচার বলিয়া যে সকল বিচার দৃষ্ট হয় তাহা বোধ হয় ইঁহারই সঙ্গে ঘটিয়াছিল। ইঁহার বিষয়ে এইরূপ শোনা যায় যে ইনি সংস্কৃত ভাষা পাঠ করিতে ও শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। বালকেরা তাহা জানিত এবং যে বালক যে দিন পড়া প্রস্তুত করিয়া না আসিত সে সেদিন ডাক্তার টাইট্‌লারকে প্রবঞ্চনা করিবার এক উপায় বাহির করিত। তাঁহাকে শুনাইয়া কোনও সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার এক চরণ আবৃত্তি করিত। অমনি ডাক্তার টাইট্‌লার তন্ময় হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন—"কি, কি, আবার বল, সমগ্র কবিতাটা বল" এইরূপে কবিতা শুনিতে ও তাহার অর্থ বুঝিতে সময়টা কাটিয়া যাইত, বালক নিষ্কৃতি লাভ করিত। সহরে এরূপ জনশ্রুতি আছে যে তিনি নাকি একবার নিজের পুত্রের ছাগলের গাড়ি চড়িয়া গড়ের মাঠে বাহির হইয়াছিলেন।

ডাক্তার টাইটলার একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন। গণিত বিদ্যায় তাঁহার মত সুপণ্ডিত লোক তখন কলিকাতাতে ছিল না। রাধানাথ টাইট্‌লারের নিকটে গণিত বিদ্যাতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে নিউটন-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'প্রিন্সিপিয়া' পড়িয়াছিলেন।

ডিরোজিও যখন একাডেমিক এসোসিএশন স্থাপন করিলেন, তখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির ন্যায় রাধানাথও তাহাতে যোগ দিলেন; এবং ডিরোজিওর শিষ্যদলের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দেহে যে প্রকার বল, মনে সেইরূপ সাহস ছিল। তিনি বাক্যে যাহা বলিতেন কাজেও সেই প্রকার করিতেন; কাহাকেও ভয় বা কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। তিনি যে স্বীয় হৃদয়স্থিত বিশ্বাসানুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করিতেন, তাহার একটী প্রমাণ এই যে কেহই তাঁহাকে দেশীয় রীতি অনুসারে একটী অল্পবয়স্কা বালিকার পাণিগ্রহণ করিতে সম্মত করিতে

পারে নাই। তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের মুখে শুনিতে পাই, তিনি মাতৃভক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বৃদ্ধবয়সেও জননীর সন্নিধানে আসিলে শিশুর মত হইয়া যাইতেন। অথচ সেই মাতার অনুরোধেও নিজের হৃদয়স্থিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পুরাতন রীতি অনুসারে একটী আট বা দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই।

রাধানাথ যখন হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন, অর্থাৎ ১৮৩২ সালে, জি, টি, সারভে আফিসে একটী ৩০৲ টাকা বেতনের কম্পিউটারের কর্ম্ম পান। পরিবারের ব্যয়নির্ব্বাহ বিষয়ে পিতার সাহায্যার্থ তাঁহাকে এই কর্ম্ম লইতে হইয়াছিল। ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার মনে ইংরাজী বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসকল সংস্কৃত ভাষাতে অনুবাদিত করিবার বাসনা প্রবল হয়। তদনুসারে মনোযোগের সহিত সংস্কৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হয়। সেখানে তিনি বহু বৎসর বাস করিয়া নানাস্থানে কাজ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার তেজস্বিতা, আত্ম-মর্য্যাদা-জ্ঞান ও কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি দেখিয়া ইংরাজগণ তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন; এবং সমকক্ষের ন্যায় তাঁহার সঙ্গে মিশিতেন।

এই কালের মধ্যে একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে তাঁহার তেজস্বিতার বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। একবার তিনি সারভে কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া দেরাদুনে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন সংবাদ আসিল যে উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট ভ্যান্‌সিটার্ট (Mr. Vansittart) মহোদয় তাঁহার সার্‌ভে আফিসের কতকগুলি কুলীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া কোন কোনও দ্রব্য বহন করাইয়া লইবার আদেশ করিয়াছেন। এই সংবাদে রাধানাথ বড়ই বিরক্ত হইয়া গেলেন। ভাবিলেন মাজিষ্ট্রেটের কুলীর প্রয়োজন হইয়া থাকিলে তাঁহাকে লিখিতে পারিতেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব বোধ হয় কালা মানুষ বলিয়া পত্র লেখা উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। তিনি বাহির হইয়া মাজিষ্ট্রেটের জিনিস পত্র সহিত স্বীয় কুলীদিগকে নিজের আফিসের প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন; এবং মাজিষ্ট্রেটের আরদালীদিগকে বলিলেন, "মাজিষ্ট্রেটের পরওয়ানা ভিন্ন, আমার কুলী দিব না।" এই কথা মাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইলে, তিনি রাগিয়া আগুন হইলেন; এবং রাজকার্য্যের অবরোধ এই দোষ

দিয়া তাঁহার নামে নালিস করিলেন। আর একজন সিবিলিয়ানের কাছে বিচার হইল। অনেকে রাধানাথকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট মার্জ্জনা চাহিতে পরামর্শ দিলেন; তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। সিবিলিয়ানের বিচারে তাঁহার ২০০ দুই শত টাকা জরিমানা হইল। তিনি গ্রাহ্যই করিলেন না; দুই শত টাকা দণ্ড দিলেন। কিন্তু ইহাতে যে আন্দোলন উঠিল তাহাতে বলপূর্ব্বক গরীব কুলীদিগকে শ্রম-সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবার রীতি রহিত হইয়া গেল।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাসকালের মধ্যে তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়া তিনি ৬০০ শত টাকা বেতনে সর্ব্বপ্রধান কম্পিউটারের পদে আরোহণ করেন। কেবল তাহা নহে; সারভে সংক্রান্ত গণিতে তিনি এমনি পারদর্শী ছিলেন, যে কর্ণেল থুলিয়ার সারভে বিষয়ে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত করেন, তাহার প্রধান প্রধান গণনা তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

১৮৫৩ সালে তাঁহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই তিনি পেনসন লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় তখন তাঁহার আচার ব্যবহার অনেকটা ইংরাজের মত হইয়া গিয়াছিল। ইংরাজী ধরণে থাকিতে ও খাইতে ভাল বাসিতেন। এমন কি তাঁহার বাঙ্গালার উচ্চারণও বদলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উৎসাহ ও আত্মোন্নতি-বাসনার উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই যে তিনি বঙ্গদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চাতে নিযুক্ত হইলেন। পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি তৎপদানুযায়ী লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে যেরূপ পরিচ্ছদ পরাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহা তাঁহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন 'যে ভাষা স্ত্রীলোকে বুঝিবে না, তাহা আবার বাঙ্গালা কি?' এই ভাবটা তাঁহার মনকে এমনি অধিকার করিল যে তিনি বাল্যবন্ধু পরম সুহৃদ প্যারীচাঁদ মিত্রকে সরল সহজ বাঙ্গালা লিখিবার জন্য প্ররোচনা করিতে লাগিলেন। উভয়ের সম্পাদকতাতে "মাসিক পত্রিকা" নামক পত্রিকা বাহির হইল; এবং অল্পদিন পরে প্যারিচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলাল" নামক উপন্যাস প্রচার করিলেন।

সরল স্ত্রীপাঠ্য ভাষাতে বাঙ্গালা লেখা রাধানাথের একটা বাতিকের মত হইয়া উঠিয়াছিল। মাসিক পত্রিকাতে কোনও প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি স্বীয়

পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন কি না। শুনিতে পাওয়া যায় একদিন রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই প্যারীচাঁদ মিত্রের গৃহের দ্বারে গিয়া ডাকাডাকি,— প্যারি, প্যারি! উঠ উঠ, এবারকার পত্রিকা পড়িয়া তোমার স্ত্রী কি বলিলেন?"

তিনি অতিশয় সহৃদয় ও স্বগণ-বৎসল লোক ছিলেন। নিজে দারপরিগ্রহ করেন নাই; ঘরে শিশু-সন্তানের মুখ দেখার সুখ হয় নাই; কিন্তু শিশুদিগকে বড় ভালবাসিতেন; আত্মীয় স্বজনের বালক বালিকাদিগকে লইয়া নিজের নিকট রাখিতেন; তাহাদের সহিত গল্প করিতে ও খেলা করিতে ভাল বাসিতেন।

জীবনের শেষদশাতে তিনি চন্দননগর গোঁদলপাড়াতে গঙ্গার ধারে একটী বাগানবাটী ক্রয় করিয়া সেখানে অবস্থিত হইয়াছিলেন। সেখানে ১৮৭০ সালের ১৭ই মে দিবসে তাঁহার দেহান্ত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা-কাল।

১৮৩৪ হইতে ১৮৪৫ সাল পর্য্যন্ত।

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই ঐ কালেজে এক নিম্নতন শিক্ষকের কর্ম্ম পাইলেন। সে পদের বেতন ৩০৲ টাকার অধিক ছিল না। সেই বেতনেই তিনি নিজের ও ভ্রাতৃদ্বয়ের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে, এই কর্ম্ম লইয়া বসিবা মাত্র তাঁহার বাসা নিরাশ্রয় ও আশ্রয়ার্থী ব্যক্তিগণের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিল। লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ উদারতা ও অমায়িকতা-গুণে কাহাকেও "না" বলিতে পারিতেন না। এইরূপে সর্ব্বদাই দুই একজন লোক আসিয়া তাঁহার ভবনে আশ্রয় লইয়া থাকিত। এই সময়ের আশ্রয়ার্থীদিগের মধ্যে একজনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি উত্তরকালে দেশের মধ্যে একজন মান্য গণ্য লোক হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম শ্যামাচরণ শর্ম্ম-সরকার। ইনি হাইকোর্টের ইণ্টারপ্রিটার ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতারূপে যশস্বী হইয়াছিলেন। প্রথম শর্ম্ম-সরকার মহাশয় খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জে তাঁহার পিতার বন্ধু চালস

রীড নামক এক ইংরাজের অধীনে দশ টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেন। যে কারণে ও যে ভাবে তিনি সে কর্ম্ম ছাড়িয়া রামতনু বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত শ্যামাচরণ সরকারের জীবনবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

"পূর্ণিয়া নিবাসী মণিলাল খোট্টা নামক তাঁহার (সাহেবের) একজন খাজাঞ্চী ছিল। তাঁহার স্বভাবগত কোনও দোষ দৃষ্টে কার্য্যের প্রতি সন্দিহান হইয়া, সাহেব তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। মণিলাল তাঁহার প্রাপ্য বেতনাদি লইয়া রীড সাহেবের নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রীড সাহেব স্বপক্ষ সমর্থন জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে সাক্ষী মানিলে, কি জানি সাহেবের অনুরোধে পাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভয়ে তাঁহার তৎকালীন ১০ টাকা বেতনের দুর্লভ চাকরিটী ধর্ম্মের অনুরোধে অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু এবং হিন্দুকালেজের সুবিখ্যাত ছাত্র রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পটলডাঙ্গার বাসায় উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ন্যায়পরায়ণ রামতনু বাবু তৎশ্রবণে আহ্লাদের সহিত তাঁহাকে নিজ প্রবাস গৃহে রাখিয়া সহোদর নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।"

"যখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। রামগোপাল বাবু যত্ন চেষ্টা করিয়া জোসেফ কোম্পানির আফিসের অধ্যক্ষ জোসেফ সাহেবকে হিন্দী পড়াইবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুকে মাসিক ১০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। তিনি তৎপরে ক্যাল্‌সেল সাহেবকে হিন্দী পড়াইবার জন্যও নিযুক্ত হন। সাহেবদিগকে হিন্দী পড়াইবার সময়েই তাঁহার বিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইল যে কিছু ইংরাজী না জানিলে বিষয় কার্য্য লাভ করা দুষ্কর, তজ্জন্য যখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বৎসর তখন তিনি রামতনু বাবুর নিকটে ইংরাজী ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন।"

পূর্ব্বোক্ত কয়েক পংক্তিতে আমরা লাহিড়ী মহাশয়ের সদাশয়তার কি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি! তিনি ৩০৲ টাকা বেতন হইতে নিজের ও ভ্রাতৃদ্বয়ের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া এবং দেশে পিতামাতার পারিবারিক ব্যয়ের যথা-সাধ্য সাহায্য করিয়াও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত রাখিতেন।

কেবল আশ্রয় দান নহে, তাহাদিগকে পড়াইবার ভার লইয়া তাহাদের ভাবী-জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের স্বলিখিত জীবন-চরিতে উল্লেখ দেখিতে পাই, যে তিনিও ইহার কয়েক বৎসর পরে, নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কালেজে পড়িবার অভি-প্রায়ে আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেওয়ানজী একস্থানে বলিতেছেন, "কলিকাতায় আমি কালীর (রামতনু বাবুর কনিষ্ঠ কালীচরণ লাহিড়ী) আত্মীয়দের অতি প্রিয়পাত্র হইলাম। নূতন বান্ধবগণের মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়দ্বয়ের মিত্রতা লাভে বড়ই সুখী হইলাম। ঠনঠনিয়ার একটী বৃহৎ বাটীর কোনও অংশে রামতনু বাবু থাকিতেন, কোনও অংশে মদন তাঁহার দুই পিতৃব্যের সহিত অবস্থান করিতেন। আমি রামতনু বাবুর অংশের এক প্রকোষ্ঠে কালীর সহিত একত্রে থাকিতাম।"

এইরূপে আত্মীয় স্বজনে বেষ্টিত হইয়া রামতনু বাবু তাঁহার প্রবাসভবনে বাস করিতেন। কিন্তু শুনিয়াছি তাঁহাদিগকে অতি ক্লেশে থাকিতে হইত। সকলকে পালা করিয়া স্বহস্তে হাট-বাজার করা জলতোলা, বাটনা কুটনা, রন্ধন প্রভৃতি সমুদয় করিতে হইত। এরূপও শুনিয়াছি যে এত কষ্ট সহিতে না পারিয়া শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় একটু অবস্থার উন্নতি করিতে পারিলেই চলিয়া যান; এবং দেওয়ানজী যে অল্পদিন ছিলেন তাহাতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়; এবং তাঁহাকে মেডিকেল কালেজ ছাড়িতে বাধ্য হইতে হয়। দেশে গিয়া এক মাস সাবধানে থাকিয়া তবে তাঁহার শরীর সারে।

যাঁহারা তাঁহার আশ্রয়ে থাকিতেন তাঁহাদের প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের স্নেহ যত্নের পরিসীমা ছিল না। কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে বন্ধুবান্ধবকে একটী ঘটনার কথা সর্ব্বদা বলিতেন, এবং বলিবার সময়ে তাঁহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। একবার পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্ব্বে কালীচরণ বাবুর চক্ষে এক প্রকার পীড়া হয়, যেজন্য তাঁহাকে চক্ষুর্দ্বয় ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষা সন্নিকট, অথচ পড়িতে নিষেধ, এই সঙ্কটে ভ্রাতৃবৎসল রামতনু বাবু এক উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি প্রতিদিন কালেজ হইতে পড়াইয়া আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কালীচরণের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পাঠ্য সমুদয় গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন;

ক্লান্তি বোধ করিতেন না। এইরূপে কালীচরণ বাবু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সময়ের আর একটী স্মরণীয় ঘটনা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশব চন্দ্রের যশোহর গমন। কেশব জজের শেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইয়া আলিপুর হইতে যশোহরে গমন করেন। ঠিক কোন্ সালে যশোহর গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না; কিন্তু সেখানে গিয়া অধিক দিন সুখে যাপন করিতে পারেন নাই। এরূপ শোনা যায়, তিনি সেখানে গিয়া অল্পদিন পরেই ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া নিজের কার্য্যের সাহায্যার্থ রাধাবিলাসকে যশোহরে লইয়া যান। ১৮৩৫ কি ১৮৩৬ সালে যশোহরে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রথম দেখা দেয়। অতএব তিনি ১৮৩৪ কি ১৮৩৫ সালে সেখানে গিয়া থাকিবেন।

যশোহরে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রথম প্রাদুর্ভাবের ইতিবৃত্ত এই যে ১৮৩৫ কি ১৮৩৬ সালের শীতকালে পাঁচ শত কি সাত শত কয়েদী যশোহরের সন্নিকটে একটী রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ঐ রাস্তাটী যশোহর হইতে মহম্মদপুর দিয়া ঢাকার অভিমুখে যাইবে এইরূপ স্থির ছিল। মহম্মদপুরে নদীর অপর পারের কাজ শেষ হইলে, পর বৎসর জানুয়ারি মাসে কয়েদিগণ নদী পার হইয়া মহম্মদপুরের পারে কাজ আরম্ভ করিল। তাহারা রামসাগর ও হরেকৃষ্ণপুরের মধ্যস্থিত রাস্তা প্রস্তুত করিতেছে, এমন সময়ে মার্চ্চ মাসে হঠাৎ তাহাদের মধ্যে এক প্রকার জ্বর দেখা দিল; এবং অল্পদিনেই প্রায় দেড়শত মজুরের মৃত্যু হইল। যাহারা মজুর খাটাইতেছিল তাহারা প্রাণ ভয়ে কাজ ছাড়িয়া পলাইল; রাস্তা নির্ম্মাণ পড়িয়া রহিল। ঐ জ্বর ক্রমে মহম্মদপুর নগরে ও যশোহরে প্রবেশ করিয়া সহর নিঃশেষ করিতে লাগিল। এই জ্বরই কয়েক বৎসরের মধ্যে নদীয়া জেলাতে প্রবেশ করিয়া উলা (বীরনগর) গ্রামকে উৎসন্ন করিয়া দিল। পরে গঙ্গাপার হইয়া হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতিকেও উৎসন্ন করিয়াছে।

এই ম্যালেরিয়া জ্বরে অগ্রে রাধাবিলাসের প্রাণ গেল; পরে কেশবচন্দ্রও তাহাতে আক্রান্ত হইলেন। তিনি শেরেস্তাদারি কর্ম্ম পাইয়াই পৈতৃক বাসভবনের শ্রীবৃদ্ধি ও পিতামাতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সংকল্প সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে

ভবধাম পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি অনেক দিন জ্বরে ভুগিয়া অনুমান ১৮৪১ কি ১৮৪২ সালে পরলোক গমন করেন।

কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় যখন এই সকল পারিবারিক ঘটনার মধ্যে আন্দোলিত হইতেছিলেন, তখন নানা কারণের সমাবেশ হইয়া সমগ্র বঙ্গসমাজকে বিশেষরূপে আন্দোলিত করিতেছিল। এই কালকে ইংরাজী-শিক্ষার প্রতিষ্ঠা কাল বলা যাইতে পারে। কথা উঠিয়াছিল এদেশীয়দিগকে কোন্ রীতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য? এই প্রশ্ন লইয়া কমিটী অব্ পবলিক ইনষ্ট্রক্শনের সভ্যগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। উভয়দলেই প্রায় সন-সংখ্যক ব্যক্তি, সুতরাং কোন মতই নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় না; কাজকর্ম্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। প্রাচ্যশিক্ষা পক্ষপাতীদিগের পরামর্শানুসারে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত কালেজে ও মাদ্রাসাতে ছাত্র আকৃষ্ট করা হইতে লাগিল, সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করিয়া স্তূপাকার বন্ধ রাখা হইতে লাগিল; দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবীদিগকে আনিয়া উক্ত কালেজদ্বয়ে প্রতিষ্ঠা করা হইতে লাগিল; তথাপি প্রাচ্য শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকের অনুরাগ দৃষ্ট হইল না। "ইংরাজী শিক্ষা চাই, ইংরাজী শিক্ষা চাই" এই রব যেন দেশের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ শিক্ষা কমিটীর নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করিল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে সকল প্রশ্নই বন্ধ রহিল। ১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায়ের বন্ধু মিষ্টর উইলিয়াম এডামকে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে ভ্রমণ করিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ওদিকে সুবিখ্যাত লর্ড মেকলে আসিয়া বিবাদক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি গবর্ণর জেনেরালের প্রথম ব্যবস্থাসচিবরূপে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিলেন। তাঁহাকে পাইয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যেন দক্ষিণ হস্ত পাইলেন।

কোর্ট অব ডাইরেক্টারস্দিগের ১৮১৩ সালের শিক্ষাসম্বন্ধীয় আদেশ ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে খাটে কি না, জানিবার জন্য ঐ নির্দ্ধারণ পত্র নূতন ব্যবস্থা-সচিব মেকলের বিচারার্থ অর্পণ করা হইল। মেকলে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ১৮৩৫ সাল ২রা ফেব্রুয়ারি দিবসে এক সুযুক্তি-পূর্ণ মন্তব্য পত্র লিপিবদ্ধ করিলেন। সেই মন্তব্যপত্রের উপসংহারে লিখিলেন;

"To sum up what I have said: I think it clear that we are

not fettered by any pledge expressed or implied; that we are free to employ our funds as we choose; that we ought to employ them to teaching what is best worth knowing; that English is better worth knowing than Sanskrit or Arabic; that the natives are desirous to be taught English and are not desirous to be taught Sanskrit or Arabic; that neither as the language of law nor as the language of religion, have the Sanskrit and Arabic any peculiar claim to our encouragement; that it is possible to make natives of this country thoroughly good English scholars; and that to this end our efforts ought to be directed."

মেকলের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়া লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় সাহসের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। ঐ বৎসরের ৭ই মার্চ্চ দিবসে তিনি এক বিধি প্রচার করিলেন, তাহাতে এই আদেশ করিলেন যে,—১৮১৩ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টারগণ যে লক্ষ টাকা এদেশীয়দিগের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এবং যাহা সে সময় পর্য্যন্ত প্রধানতঃ প্রাচ্য শিক্ষার উন্নতিবিধানে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহা অনন্তর কেবল "ইউরোপীয় সাহিত্য-বিজ্ঞানাদি শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে, এবং ইংরাজী ভাষাতেই সে শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

এই আদেশ প্রচার হইবামাত্র কমিটী অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাক্‌শনের মধ্যে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা পক্ষপাতীদিগের মধ্যে বহুদিন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা ঘোরতর ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হইয়া পড়িল। প্রাচ্য-শিক্ষা-পক্ষীয়গণ মেকলের সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্যপত্রের উত্তর দিতে পারিলেন না; পরন্তু মেকলের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া গেলেন। তাহার একটু কারণও ছিল। মেকলেকে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানেন যে, মেকলে মৃদুভাবে আপনার মত প্রকাশ করিবার লোক ছিলেন না। তিনি ঐ মন্তব্য পত্রেরই একস্থানে লিখিয়াছিলেন;—

"I have no knowledge of either Sanskrit or Arabic. But I have done what I could to form a correct estimate of their values. I have read translations of the most celebrated Ara-

bic and Sanskrit works. I have conversed both here and at home with men distinguished by their proficiency in Eastern tongues. I am quite ready to take the oriental learniug at the valuation of the orientalists themselves. I have never found one among them, who could deny that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia."

"এক শেল্‌ফ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই"—এই কথাটা প্রাচ্য শিক্ষা-পক্ষীয়দিগের গাত্রে তপ্তজলের ছড়ার ন্যায় পড়িল। তাঁহারা ক্ষেপিয়া আগুন হইয়া গেলেন। পাবলিক ইনষ্ট্রাক্‌শন্ কমিটীর সভাপতি মেঃ সেক্‌স্‌পিয়ার ও সেক্রেটারি মেঃ জেম্‌স্ প্রিন্‌সেপ পদত্যাগ করিলেন। গভর্ণর জেনারেল মেকলেকে উক্ত কমিটীর সভাপতির পদে বরণ করিলেন। এদেশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে মেকলের রাজ্য আরম্ভ হইল।

বলা বাহুল্য, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোত্তীর্ণ যুবকদল সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত মেকলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহা নহে, তাঁহারাও মেকলের ধূয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন, যে,—এক সেলফ ইংরাজী গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই। তদবধি ইঁহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়া পড়িলেন, সেক্‌স্‌পিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধঃকৃত হইয়া Edgeworth's Tales সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদান্ত গীতা প্রভৃতি দাঁড়াইতে পারিল না।

মানুষ যে আলোক পায় তদনুসারেই যদি চলে তবেই তাহার প্রশংসা। আমরা এক্ষণে এই যুবকদলের অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার অনুমোদন করিতে পারি না সত্য, কিন্তু তাঁহারা যে অকপটচিত্তে স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের আলোক অনুসারে চলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা

হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু ডেভিড হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিন জনই তাঁহাদিগকে একই ধূয়া ধরাইয়া দিলেন ;—প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয়, এবং প্রতীচীতে যাহা আছে তাহাই শ্রেয়ঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার ঝোঁকে বঙ্গসমাজ বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে। তাহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

রামগোপাল ঘোষের ভবনে এই যুবকদলের এক আড্ডা ছিল। তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে রামতনু লাহিড়ী তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি আদর করিয়া "তনু" "তনু" বলিয়া ডাকিতেন। প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে লাহিড়ী মহাশয় প্রিয়বন্ধু রামগোপালের ভবনে যাইতেন ; এবং অনেক দিন সেইখানে রাত্রি যাপন করিতেন। এই বন্ধু-বর্গের সমাগমকাল অতি সুখেই কাটিত। মধ্যে মধ্যে শেরী শ্যাম্পেন চলিত বটে, কিন্তু সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। রামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি যে এই যুবকদল একত্র সমবেত হইলেই কোন না কোন হিতকর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত ও সদালাপে সময় চলিয়া যাইত। সকলেরই মনে জ্ঞান-স্পৃহা অতিশয় উদ্দীপ্ত ছিল। পরস্পরের জ্ঞানোন্নতির জন্য তাঁহারা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার কতকগুলি অগ্রে উল্লেখ করা গিয়াছে ; যথা "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকা। রসিককৃষ্ণ মল্লিক এই দ্বিভাষী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি কর্ম্মসূত্রে সহর পরিত্যাগ করিলে তাঁহার যুবক বন্ধুগণ তাহার সম্পাদনের ভার গ্রহণ করেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর "একাডেমিক এসোসিএশন" হেয়ারের স্কুলে উঠিয়া আসে। এই যুবকদল মহামতি হেয়ারকে তাহার সভাপতিরূপে বরণ করিয়া সভার কার্য্য চালাইতে থাকেন। দুঃখের বিষয় ১৮৪৩ সালের মধ্যে ঐ সভা উঠিয়া যায়। এই নব্যবঙ্গের নেতৃগণ নিরুদ্যম না থাকিয়া, আপনাদের জ্ঞানোন্নতির জন্য নিজেদের মধ্যে একটী সার্কুলেটিং লাইব্রেরী ও একটী এপিষ্টোলারি এসোশিএশন স্থাপন করেন। লাইব্রেরী হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ক্রয় করিয়া বন্ধুগণের পাঠের জন্য বিতরণ করা হইত ; এবং এপিষ্টোলারি এসেসিএশনের যোগে কে কি পড়িলেন, সে বিষয়ে চিঠী পত্রে আলাপ হইত। রামগোপাল ঘোষ ও লাহিড়ী মহাশয় এই দুই কার্য্য প্রধানভাবে দেখিতেন।

এই সকল ক্ষুদ্র চেষ্টা অবশেষে মহৎ ফল প্রসব করিল। ইঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন যে নিজেদের জ্ঞানোন্নতির জন্য একটী সভা স্থাপন করা আবশ্যক। তদনুসারে তারিণীচরণ বাঁড়ুয্যে, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও রাজকৃষ্ণ দে, এই কয়েকজনে স্বাক্ষর করিয়া ১৮৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি দিবসে এক অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিলেন। তাহাতে এক নূতন সভার প্রস্তাব করিয়া বলা হইল যে সর্ব্ববিধ জ্ঞান উপার্জ্জনে পরস্পরের সহায়তা করা ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতিবর্দ্ধন করা উক্ত সভার উদ্দেশ্য। এই অনুষ্ঠানপত্রের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য অপর কথা এই তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে এই নিয়ম করা উচিত যে যিনি বক্তৃতা দিব বলিয়া সমুচিত কারণ ভিন্ন বক্তৃতা না দিবেন, তাঁহাকে জরিমানা দিতে হইবে। এরূপ নিয়ম কোনও সভাতে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে তাঁহারা কিরূপ চিত্তের একাগ্রতার সহিত উক্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কালেজের তদনীন্তন সেক্রেটারী রামকমল সেন মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত কালেজের হল চাহিয়া লইয়া সেখানে নব্যশিক্ষিত দলের এক সভা আহ্বান করা হইল। উক্ত আহ্বানানুসারে ১২ই মার্চ্চ দিবসে ঐ হলে উক্ত সভার অধিবেশন হয়। সেই সভাতে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীকে সভাপতি করিয়া "Society for the Acquisition of General Knowledge, অর্থাৎ "জ্ঞানার্জ্জনসভা"নামে এক সভা স্থাপিত হয়। ঐসভা কয়েকবৎসর জীবিত থাকিয়া যুবক সভ্যগণের জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ঐ সভাতে কিরূপ বিষয় সকলের আলোচনা হইত, তাহার ভাব পাঠকগণের গোচর করিবার জন্য কয়েকজন বক্তার ও তাঁহাদের আলোচিত বিষয়ের নাম উদ্ধৃত করিতেছি :—

K. M. Banerjea—Reform—civil and social—among educated natives.

Hurro Chunder Ghose—Topographical and statistical sketch of Bankurah.

Mahesh Chunder Deb—Condition of Hindu women.

Govind Ch. Sen—Brief outline of the History of Hindustan.

Govind Ch. Bysak—Desciptive notices of Chittagong.

Peary Chandra Mitra—State of Hindustan under the Hindus.

Govind Ch. Bysak—Descriptive notices of Tipperah.

Prosonno Kumar Mitra—The Physiology of Dissection.